

Vol. 4 | Issue 1 | 2025

सूत्र

SUTRA

सूत्र



## Editorial Board

Suman Chakrabarty

Nibedita Konar

Gurudas Ghosh

Madhurita Das

Pallabi Roy

Riju Pal

Sudip Chakrabarty

Sutanu Mukhopadhyay

*We are delighted to acknowledge  
the unwavering patronage from*

Tanusri Saha Dasgupta, Director

Shohini Majumder, Registrar

Debashish Bhattacharjee Deputy Registrar (Administration)

Saumen Adhikari, Librarian cum Information Officer

Suman Saha, Deputy Registrar (Finance)

Santosh Kr. Singh, Assistant Registrar (Purchase)



*A Student-Staff Initiative*

*Published by : The Literary Arts Group of **Muktangan***

**S N Bose National Centre for Basic Sciences**

Block-JD, Sector-III, Salt Lake, Kolkata - 700106

# সূচিপত্র / সুচী / Contents

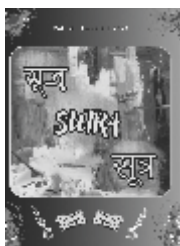


সম্পাদকীয় / সंपादकीय / Editorial	3
প্রবন্ধ / लेख / Article	
এস এন বোস সেন্টারের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ :	
কিছু স্মৃতিচারণ — বিজয় প্রামাণিক	5
উজ্জ্বল কণাপদার্থবিদ - বিভা চৌধুরী — ইন্দ্রজিৎ ঘোষ	8
INSTINCTS — Sovik Roy	10
গল্প / कहानी / Story	
ভুলেও না ভোলার গল্প — শুভদীপ চক্রবর্তী	11
ইচ্ছেপুরণ — অরুণ কুমার দাস	13
BECKONING THE CAT — Poonam Kumari	14
আমি গল্প লিখেছি — সুদীপ চক্রবর্তী	16
নকুড়মামার সঙ্গে — গুরুদাস ঘোষ	18
INTROSPECTION কিস্বা DELIRIUM —	
সুতনু মুখোপাধ্যায়	22
কবিতা / कविता / Poem	
তার প্রতি — অনন্যা চক্রবর্তী	23
ফুল ধরা মেয়ে — অনন্যা চক্রবর্তী	24
A CONFESSION — Gaurab Samanta	26
SOMETHING — Abha Mahato	26
মা — অর্ধেন্দু পাল	27
দায়ী কে!! — সুরঞ্জনা চক্রবর্তী	27
ইকারাস — রূপায়ন সাহা	28
প্রত্যাবর্তন — প্রাপ্তি মুখার্জি	28
প্রিয়তমাকে লেখা আমার চিঠি — বিধান কুন্তকার	29
THE JOURNEY — Shaheerah Shahid	30
ESSE OF LIFE — Shaheerah Shahid	30
THE COLOUR OF LONELINESS —	
Santanu Mukherjee	30
THE TRAVELERS — Santanu Mukherjee	31
PARALLEL — Sayanti Mondal	31
‘बाल दिवस’ की शुभकामनाएं — रेनु सिंह	32
सर पढ़ा रहे हैं! — সুদীপ চক্রবর্তী	33
রাগ - রাগিণীর খেলাঘর — অর্পিতা জানা	34
কবিতা — শোভন দেব মণ্ডল	35
সময় — অংকিতা রোজডিয়া	36
यादों का कारवां — অংকিতা রোজডিয়া	36
মিলন ভূমি — সায়েন ঘোষ	37
জ্বলন্ত নিরবতা — কৌশিক দাস	38
শেষ যাত্রা — শিঞ্জিনী পাল	39
BIZARRE রিত — সুতনু মুখোপাধ্যায়	39
সাতকাহন — সুদীপ চক্রবর্তী	40

ভ্রমণকাহিনী / যাত্রা / <b>Travelogue</b>	রাঙা মাটির পথের মুড়োয় — পল্লবী রায়	44	
	তাজপুর - মন্দারমণি ভ্রমণ — অনুলেখা দে	47	
	Adventures in Kabini : A Roller coaster Journey of Surprises And Laughter — Tuhin Kumar Maji	50	
	Discovering The World, Discovering Myself : A Scholar's Tale — Pratap Kumar Pal	55	
	ফুলের উপত্যকায় একা — গুরুদাস ঘোষ	61	
বিবিধ / বিবিধ / <b>Miscellaneous</b>	Math Sudoku — Ankita Rojariya	7	
	Cultural Activities of The Centre : 2023-2024 — Pritam Roy & Anusree Sen	72	
	Sports Activity in The Centre : 2023-2024	76	
	Photo Fest 2023 — Anupam Gorai & Swarnali Hair	80	
	Photo Fest 2024 — Gurudas Ghosh & Rupam Porel	80	
চিত্রসূচি / চিত্রসূচী / <b>Illustrations</b>	Saratchandra Chattopadhyay —	26	
	Suranjana Chakrabarty	75	
	A girl who loves to hide — Ananya Chakraborty	75	
	Netaji — Bipasha Hazra	82	
	Abdul Aziz Mandal	82	
	Mirror of soul — Ananya Chakraborty	83	
	Abdul Aziz Mandal	84	
	Anusree Sen	84	
	Sweta Ghosh	85	
	Arnab Mukherjee	85	
	Voyagers — Arnab Mukherjee	86	
	Mystic Woods — Shaheerah Shahid	86	
	The celestial city — Shaheerah Shahid	87	
	The colourful Cosmos (From my memory of Corfu, Greece) — Anwesha Chakraborty	87	
	Campus — Sourav Mondal	88	
	কালো? তা সে যতই কালো হোক — Sumanti Patra	88	
	অবসর — Sumanti Patra	89	
	Sunset — Asesh Bera	89	
	Reflection — Arpita Jana	90	
	মাছের চোখে বনেদি বাড়ি — Diraj Tapader	90	
	Triveni — Diraj Tapader	90	
	দুর্ভেদ্য — Abha Mahato	91	
	বিশ্বকবি — Suranjana Chakrabarty	91	
	নিসর্গ — Abha Mahato	92	
	Howrah Bridge: Hanging Heart of the City of Joy -Renu Singh	92	
	Mesmerizing Sunset on the river bank of Hooghly - Renu Singh	92	
	পাতা বরার মরশুম — Riju Pal	3rd cover	
	নদী আপন বেগে পাগল পারা... — Riju Pal	3rd cover	
	<b>Cover design</b>	Sudip Chakrabarty	







Lack of time,  
pandemic –  
nothing could  
stop the  
consistent  
publication of  
sutra. This is  
the biggest  
achievement.  
In other  
words, that's  
the vital force  
to run the  
magazine.

सूत्र पत्रिका के काम शुरुआत रचनाओं को इकट्ठा करने से होती है। पत्रिका के लिए आपस में चर्चा करना, जरूरत पड़ने पर लेखकों से बात करना, पत्रिका के लिए तस्वीरों का चयन करना, पत्रिका का कवर बनाना, मुद्रण से पहले प्रूफरीडिंग करना – ये सभी कई लोगों के लिए नए अनुभव हैं। साथ काम करने के संदर्भ में उनके बीच की समझा बहुत अच्छी हो जाती है। यह एक स्मृति है जो हमेशा के लिए बनी रहती है। जो कभी पत्रिका के प्रकाशन में सक्रिय रूप से शामिल थे, वे अब देश या विदेश में पाठकों की भूमिका में हैं। जब सूत्र का नया अंक प्रकाशित होता, तो वे इसे डिजिटल रूप से भी पढ़ते हैं। पूर्व और नवागंतुक पाठकों के बीच संबंध बन जाता है। हर साल एक नया योग्य हाथ 'सूत्र' पत्रिका के प्रकाशन बागडोर थामता है। 'सूत्र' पत्रिका की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि समय की कमी, कोरोना जैसी महामारी के बावजूद सूत्र का प्रकाशन नहीं रुका। दूसरे शब्दों में कहे तो यह 'सूत्र' पत्रिका की जीवन शक्ति है।

हमें उम्मीद है कि इस पत्रिका में प्रकाशित विभिन्न निबंध, कहानियों, कविताओं, यात्रा वृत्तान्तों, तस्वीरों और विवरण के साथ स्रोतों की यह नई संख्या पिछले अंकों की तरह ही आपके संवेदनाओं को स्पर्श करेगी।

## Editorial



**Sutra** magazine was first published in 2019. Before the publication of the magazine, the name 'Sutra' was selected by the editorial board members from the suggestions received. The word 'Sutra' has several meanings. It refers to 'connection' or the 'thread'. The thread is also used to hold different items together. The word 'Sutra' may mean any scientific or mathematical formula or a remedy to a problem. Whichever it means, it is always positive.

As a literary magazine, Sutra's role is to transcend the boundaries of time and unite the creative thoughts of the members of the 'Bose family'. From that perspective, the name of the magazine is successful. There is another invisible connection that bounds the members of Sutra in a team. Everytime some students spontaneously came forward to be a part of the 'Sutra' team. New faces come. Those faces are again replaced by new faces. New editorial board is formed. Collecting materials for Sutra, discussing among editorial board members, talking to the authors, if needed, selecting pictures, creating covers, proof reading before printing – all these are new experiences for many. And in the context of working together, the understanding between editorial group becomes sound, which remains a memory forever. Those who were once actively involved in publishing 'Sutra' are now readers at India or abroad. However, when the new issue of 'Sutra' is published, they also read it's digital version uploaded on the web. The connection between the former and the existing members is created. New hands come forward to hold the flag they once held. Lack of time, pandemic – nothing could stop the consistent publication of sutra. This is the biggest achievement. In other words, that's the vital force to run the magazine.

We hope that this new issue of 'Sutra' (volume 4) with various articles, stories, poems, travelogues photographs and reports of various sports and cultural activities held in the center will be similarly attractive like the previous issues.

# এস এন বোস সেন্টারের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ : কিছু স্মৃতিচারণ

বিজয় প্রামাণিক

টাইম মেশিনে যদি পিছিয়ে যাওয়া যেত ৩৬ বছর, অর্থাৎ ১৯৮৮ সালে, তাহলে এই জেডি ব্লক-এ একটা উন্মুক্ত প্রান্তর ছাড়া কিছুই পাওয়া যেত না, যার নিচে শুধুই বালি আর বালি। কীভাবে গড়ে উঠল এই কেন্দ্র, তা অনেকে হয়তো জানেন। যাঁরা জানেন না, তাঁদের জন্যই এই লেখা।

কেন্দ্রের প্রথম নির্দেশক অধ্যাপক চঞ্চল কুমার মজুমদারের মুখে শুনেছি, এই কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল পার্লামেন্টের এক প্রস্তাবের ভিত্তিতে, যাতে খ্যাতনামা বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর স্মরণে একটি জাতীয় বিজ্ঞান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল। এই প্রস্তাবকে কার্যকর করতে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮২ সালে একটি কমিটি গঠন করে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স-এর নির্দেশক অধ্যাপক এ কে বড়ুয়াকে অনুরোধ করেছিলেন নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্য একজন যোগ্য নির্দেশক খুঁজে দিতে। সেই কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৯৮৬ সালের ১৩ই জুন West Bengal Societies Act অনুসারে S N Bose National Centre for Basic Sciences – এর প্রতিষ্ঠা হয় এবং গভর্নিং বডি'র সদস্যদের সম্মতিক্রমে কেন্দ্রের নির্দেশকের দায়িত্ব নেন অধ্যাপক চঞ্চল কুমার মজুমদার।

কেন্দ্রের প্রথম ঠিকানা ছিল সল্টলেকের DB-17। তার পর জমি খোঁজা শুরু হল। যে সব জায়গায় জমি দেখা হল তার মধ্যে JD ব্লকের খোলামেলা জায়গাই অধ্যাপক মজুমদারের পছন্দ হয়েছিল। ফলে কেন্দ্রের স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে নির্বাচিত হয় সল্ট লেক সেক্টর ৩ এর জে ডি ব্লকটি। এই ব্লকের মোট জমির পরিমাণ ছিল ১৫ একর, যার মধ্যে ১০ একর জমি রাজ্য সরকার অনুদান হিসেবে দিয়েছিল এবং বাকি ৫ একর জমি কেন্দ্র সরকার ৩৬.৩ লক্ষ টাকায় কিনেছিল। জমি অধিগ্রহণের পর কেন্দ্রের প্রথম কাজ ছিল জমিটির চারপাশে একটি প্রাচীর

নির্মাণ। এই প্রাচীর নির্মাণকে কেন্দ্র করেই আমার এই কেন্দ্রে যোগদান।

সালটা ছিল ১৯৮৮। তখন আমি এস বি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন-এ কাজ করি। তখন কেন্দ্রে ক্যাম্পাস ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন এস কে দত্ত। এস বি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন-এ তাঁর যাতায়াত ছিল। সেই সূত্রে এস কে দত্ত-র সঙ্গে যোগাযোগ হয় এবং দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে জে ডি ব্লকের বাউন্ডারী ওয়াল তৈরির কাজ তদারকি করতে শুরু করি। পাঁচ ফুট উচ্চতার দীর্ঘ প্রাচীর। কিছুকাল কাজ করার পর সেনাবাহিনীতে যোগদানের ইচ্ছা নিয়ে গয়াতে ট্রেনিং করতে যাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরি অধরাই থেকে যায়। ফিরে এসে আবার আগের কোম্পানীতে (এস বি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন-এ) যোগদান করি। একদিন জে ডি ব্লকে আসি এবং আমাকে দেখে তৎকালীন নির্দেশক প্রফেসর চঞ্চল কুমার মজুমদার বলেন, তোমার কথা ভাবছিলাম, তুমি কি বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন-এ কাজ করবে? তাহলে অ্যাডমিন অফিসের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিচ্ছি। আমি সম্মত হলে উনি আমাকে কেন্দ্রের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার ড. পাল চৌধুরির ঘরে নিয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, কবে থেকে আসতে পারবে? আমি বললাম, স্যার, আমি যেখানে কাজ করছি সেখানে একটা



মূল বিল্ডিং এর ভিত পূজায় নির্দেশক চঞ্চল কুমার মজুমদার

tilt cylinder assemble করে তবে আসতে পারবো। দয়া করে যদি কয়েকটা দিন সময় দেন তা হলে ভালো হয়, কারণ সমস্ত কাজটা আমিই করছি। উনি বললেন, ঠিক আছে তুমি এসো, আমরা তোমাকে রাখবো। শুধু তাই নয়, বললেন, বিজয়, তোমার দায়িত্বজ্ঞান আছে, তার জন্য ধন্যবাদ।

২৪ এপ্রিল ১৯৯১ তারিখে আমি বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কাজে যোগ দিলাম। এ কাজে আমার শিক্ষক বা গুরু ছিলেন এস কে দত্ত। উনি বলতেন, সব সময় schedule পড়বে আর drawing ফলো করবে। তাহলে তোমাকে কেউ ঠকাতে পারবে না। ওনার থেকে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কাজ শিখেছিলাম। সেন্টারের প্রাচীর তৈরির পরে আজকের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং এর বি ব্লক (এখন যেটা পিছনের অংশ), স্টাফ কোয়ার্টার, পাম্প হাউস এবং ইলেকট্রিক্যাল সাব স্টেশন তৈরির কাজগুলো তখন একই সঙ্গে হচ্ছিল।

অবশেষে ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে কন্সট্রাক্টর গেস্ট হাউস (ভাগীরথী) এবং স্টাফ কোয়ার্টারের কাজ শেষ করে চাবি হ্যান্ডওভার করে দিল।



গেস্ট হাউস

স্টাফ কোয়ার্টার বাসযোগ্য হতেই ডিরেক্টর সহকর্মী গোপালচন্দ্র ঘোষকে quarter-এ থাকতে অনুমতি দিলেন এবং ক্যাম্পাস ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার নির্মল কুমার ভট্টাচার্যকে বললেন, গেস্ট হাউস চালু করতে হবে, পাম্প হাউস চালাতে হবে। আমাদের যে সব ছেলেরা কাজ করছে তাদের কাজে লাগাতে হবে। ক্যাম্পাস ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার ভট্টাচার্যের কথামতো আমি ডিরেক্টরকে চিঠি লিখলাম এবং মিস্টার ভট্টাচার্য তা ফরওয়ার্ড করে দিলেন। পরের দিন ডিরেক্টর এসে গেস্ট হাউসের চাবি আমার হাতে দিয়ে বললেন, তোমাকে কেয়ারটেকারের দায়িত্ব দেওয়া হল। এবার তুমি দেববাবুর (সুনীশ কুমার দেব) সঙ্গে কথা বলো কারণ সায়েন্স কংগ্রেস আসন্ন (৩রা জানুয়ারি ১৯৯৫)। এর

মধ্যে বিছানার ব্যবস্থা করতে হবে, ঘর রেডি করতে হবে। কোটেশন নিতে হবে। আমি, গোপালদা, দেবদা সকলে মিলে ছুটলাম ফার্নিচারের দোকানে, কাপড়ের দোকানে। হাতে সময় মাত্র এক সপ্তাহ। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যেই কাজ শেষ হল।

মনে পড়ে, ২রা জানুয়ারি রাতে এলেন প্রফেসর মুসিলি। পরের দিন থেকে আরো অনেকে। এভাবে, আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন না হলেও সায়েন্স কংগ্রেসের মাধ্যমে গেস্ট হাউস চালু হল। গেস্ট হাউসের কাজে আমাকে সাহায্য করার জন্য এলেন দুলাল চ্যাটার্জী। এর পর থেকে গেস্ট হাউসে বুকিং আসতে শুরু করলো। ৩০ টাকা, ৫০ টাকা করে ঘর ভাড়া। অনেক বিজ্ঞানীরা আসতেন।

ইতিমধ্যেই মেইন বিল্ডিং-এ অধ্যাপক চঞ্চল মজুমদার নিজের অফিসে বসতে শুরু করেছেন। পঠন-পাঠনও শুরু হয়ে গেছে। এখন যেখানে লাইব্রেরির স্টকগুলি রয়েছে, সেখানে ছিল একটি সেমিনার হল। মূল বিল্ডিং-এর চারতলায় ছিল কম্পিউটার ল্যাব।



দোতলার সেমিনার হল (এখন লাইব্রেরি)



কম্পিউটার ল্যাব

১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে চঞ্চল কুমার মজুমদার অবসর গ্রহণ করেন। অবসরের পরেও তিনি গবেষণার





নানা কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিলেন। যুক্ত ছিলেন Indian National Science Academy এবং Indian Statistical Institute এর সঙ্গে। দুর্ভাগ্যক্রমে ২০০০ সালের ২০ জুন মাত্র ৬১ বছর বয়সে চঞ্চল কুমার মজুমদার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। ১৯৯৯ সালে অধ্যাপক মজুমদারের অবসরের পরে অধ্যাপক সুশান্ত দত্তগুপ্ত নির্দেশক এর দায়িত্বে আসেন। পরবর্তীতে অধ্যাপক অরুণ কুমার রায়চৌধুরী, অধ্যাপক শমিত কুমার রায় এবং বর্তমানে অধ্যাপক তনুশ্রী সাহা দাশগুপ্ত নির্দেশকের দায়িত্ব নেন।

গত তিন দশকের বেশি সময়ে কত যে বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এই কেন্দ্রে এসেছেন, তা গুনে বলা কঠিন। শিল্পী, সাহিত্যিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রের দিকপাল ব্যক্তিত্বও এখানে এসেছেন, বঙ্কতা দিয়েছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কিংবা অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম। অনেক বিশিষ্ট অতিথি নিজে হাতে বৃক্ষ রোপন করেছেন। তাই কেন্দ্রের গাছগুলিও শুধুমাত্র গাছ নয়, যেন এক দীর্ঘ ইতিহাসের সাক্ষী।

গেস্ট হাউসের দায়িত্বের পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিভাগে, যেমন অ্যাকাউন্টস, পুনরায় গেস্ট হাউস, সি কে এম ল্যাব, লাইব্রেরী, কম্পিউটার সেকশন, ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদিতে কাজ করি। ধূসর উন্মুক্ত প্রান্তর কীভাবে পরিবর্তিত হল সবুজে ছাওয়া অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত এক গবেষণা কেন্দ্রে — তা প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতাও আমার জীবনের এক বড় প্রাপ্তি। এই কেন্দ্রে কাটানো দীর্ঘ কর্মজীবনের শেষে তাই তো স্মৃতির টাইম মেশিনে ফিরে দেখি অনেক পুরনো ঘটনাকে, হারানো মানুষকে।



# উজ্জ্বল কণাপদার্থবিদ - বিভা চৌধুরী

ইন্দ্রজিৎ ঘোষ

সূর্য ও অন্যান্য মহাজাগতিক উৎস থেকে শক্তিশালী প্রোটন ও অন্যান্য কণা যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে পরে তখন আমরা সেগুলিকে মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিক রে বলে অভিহিত করি। শক্তিশালী কণাত্বরণ যন্ত্র আবিষ্কারের আগে এই রশ্মিই ছিল আমাদের কাছে পদার্থের গঠন জানার একমাত্র উপায়। কণাপদার্থবিদ্যার সেই যুগেও আমাদের দেশে এক বঙ্গনারী করে গেছেন বিশ্বমানের গবেষণা। তাঁর পরিশ্রম তাঁকে এনে দিয়েছিল নোবেল পুরস্কারের খুব কাছে। সেই মানুষটির নাম বিভা চৌধুরী।

বঙ্কু বিহারী চৌধুরী ও উর্মিলা দেবীর কন্যা বিভা দেবী ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিজের ব্যাচের একমাত্র মেয়ে হিসেবে এম. এসসি. ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি জগদীশ চন্দ্র বসুর দৌহিত্র দেবেন্দ্র মোহন বসুর কাছে গবেষণা করতে শুরু করেন পি. এইচ. ডি. ডিগ্রির জন্যে। তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম মহিলা কণাপদার্থবিদ।

আমাদের চারপাশে সমস্ত কিছু অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা বা পরমাণু ও অণু দিয়ে তৈরি। অণুগুলির গঠন আমাদের সৌরজগতের মতো - এর মাঝে খুব অল্প জায়গা জুড়ে আছে এক ধনাত্মক আধান যুক্ত কেন্দ্রক ও তাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে ইলেকট্রন। এই কেন্দ্রকের মধ্যে থাকে দু ধরনের উপাদান - প্রোটন ও নিউট্রন। কেন্দ্রকের মধ্যে এই প্রোটন এবং নিউট্রন কী ভাবে পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে তা নিয়েই গবেষণা করছিলেন চৌধুরী ও বসু। এই কাজে তাঁদের হাতিয়ার ছিল এক্সটেন্সিভ এয়ার শাওয়ার। মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে খুব উচ্চগতিশক্তির অর্থাৎ ১০০ টেরা ইলেকট্রন ভোল্ট (১ এর পর ১৪টা শূন্য) শক্তির প্রোটন কণা যখন বায়ু মণ্ডলে প্রবেশ করে তখন বায়ুমণ্ডলে অণু পরমাণুর সাথে বিক্রিয়া করে প্রচুর কণা তৈরি করে যা ফটোগ্রাফিক প্লেটে একটা বর্ণা বা শাওয়ারের মতো দেখতে লাগে। বিভা দেবীর কাজ ছিল বিশেষত এই ধরনের শাওয়ার পর্যবেক্ষণ করা।

১৯৩৬ সাল নাগাদ যখন বিভা দেবী গবেষণা শুরু করলেন তখন জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিদেকি ইয়ুকাওয়া তাত্ত্বিক ভাবে মেসন নামের এক কণার কথা কল্পনা করেন যা প্রোটন নিউট্রনকে এতো জোরে আটকে রাখতে পারে। এরপরেই সমস্ত বৈজ্ঞানিক মহল ইয়ুকাওয়ার মেসন খোঁজার জন্যে উঠে পড়ে লাগে। এখানে কাজ করার সময় তিনি অস্ট্রিয়ান মহিলা পদার্থবিজ্ঞানী মারিয়েটা ব্লাউয়ের পদ্ধতি অনুসরণ করে নিউক্লিয়ার ইমালশন প্লেটে মহাজাগতিক রশ্মির ছবি তোলেন। পরে বসুর পরামর্শে তিনি ফটোগ্রাফিক প্লেট ব্যবহার করা শুরু করেন। বিভা দেবী দার্জিলিং, সান্দাকফুতে পর্বত চূড়ায় উঁচু জায়গাতে প্লেট রেখে দিনের পর দিন মাইক্রোস্কোপের তলায় মহাজাগতিক রশ্মির গতিপথ পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪২ এর মধ্যে বসু ও চৌধুরী নেচার পত্রিকাতে তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে তাঁদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধগুলি থেকে প্রথম বিভা দেবী ইলেক্ট্রনের চেয়ে প্রায় দুইশত গুণ ভারী এক কণার গতিপথ দেখে সেটিকে মেসন (তখন মেসোট্রন) বলে শনাক্ত করেন।<sup>(৬-৮)</sup> ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় ভারতে ফটোগ্রাফিক প্লেটের অপ্রতুলতা দেখা যায়। এর ফলে বিভা দেবী তাঁর গবেষণা চালিয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু এরই কয়েক বছর পর ব্রিটেনের সেসিল ফ্রাঙ্ক পাওয়েল একই পদ্ধতিতে আরো উন্নত ফটোগ্রাফিক প্লেট ব্যবহার করে মেসন কণার অস্তিত্ব নিশ্চিত রূপে প্রমাণ করেন। পাওয়েল তাঁর এই কাজের জন্যে ১৯৫০ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। যুদ্ধ শুরু না হলে হয়তো এই পুরস্কার যেতে পারতো বিভা দেবীর হাতেই।

যুদ্ধ ও তার পর ভারতে স্বাধীনতা অর্জনের সময় গবেষণা চালানো তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়লে ১৯৪৫ সালে তিনি যোগদান করেন পি এম এস ব্ল্যাকেটের গবেষণাগারে। ব্ল্যাকেট ১৯৪৮-এ নোবেল পুরস্কার পান। বিভা দেবী ১৯৪৯ সালে নিজের কাজ উপস্থাপন করেন

এবং ১৯৫২ সালে পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি পদার্থবিদ্যায় পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। ম্যানচেস্টারে থাকা কালীন ম্যানচেস্টার হেরাল্ড নামক এক পত্রিকাতে তিনি এক সাক্ষাৎকার দেন। এর থেকে ওনার ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। ওনার কথায়, মহিলাদের আরো বেশি করে পদার্থবিদ্যা পড়ার দিকে এগিয়ে আসা উচিত। কারণ, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ভারত ও ইংল্যান্ড দুই জায়গাতেই মহিলা বিজ্ঞানী প্রয়োজন। বিভাদেবীর কথগুলির আজও প্রাসঙ্গিকতা আছে। এর থেকেই বোঝা যায় যে কতটা সুদূরপ্রসারী ছিল তাঁর ভাবনা চিন্তা।

নোবেল প্রাইজ অথবা থাকার পরও তাঁর দুর্ভোগের শেষ হয়নি। ১৯৪৯ সালে নিজের পি এইচ ডি থিসিস জমা দেওয়ার পর তিনি ফ্রান্সে ইমালশন ফটোগ্রাফি শেখার জন্যে এক গবেষণাগারে যোগদান করার জন্যে আবেদন করেন। তাঁর সমর্থনে তাঁর পি এইচ ডি থিসিসের পরীক্ষক জে জি উইলসনের শংসাপত্র। বিভা আর্থিক সহায়তার জন্যে ভারত সরকারের কাছে আবেদন করেন। কিন্তু বিজ্ঞানী হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা পদার্থবিদ হিসেবে বিভা চৌধুরীর ক্ষমতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেন এবং সরকারের কাছে তাঁর আবেদন বাতিল হয়ে যায়। বিভা দেবী আবারও বঞ্চিত হন ইমালশন ফটোগ্রাফির শেখার সুযোগ থেকে।

দেশে ফেরত আসার পর ভাবার সংশয় সত্ত্বেও পি এম এস ব্লাকেটের প্রশংসাপত্র সমেত বিভা চৌধুরী টাটা ইনস্টিটিউট ফর ফাউন্ডামেন্টাল রিসার্চে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করা প্রথম মহিলা বিজ্ঞানী। কিন্তু তাঁর জায়গা হয় সবচেয়ে নিচু পোস্টে। এখানে কাজ করার অভিজ্ঞতা সুখকর হয়নি। তাই তিনি সেখান থেকে ১৯৫৩ সালের শেষের দিকে শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যোগদান করেন। বিভা চৌধুরীর কর্ম জীবন সম্বন্ধে কিছুটা ধোঁয়াশা আছে। এস সি রায়ের মতে ১৯৫৪ থেকে ১৯৬১ সালে বিভা চৌধুরী কিছু বছরের জন্যে কলকাতা ফেরত আসেন এবং কিছু সময় বিদেশে কাটান।<sup>(৫)</sup> কিন্তু অন্যান্য সূত্র মতে তিনি ১৯৫৭ সালে পি আর এলে যোগদান করেন।

আহমেদাবাদে এই প্রতিষ্ঠানে তাঁর কাছে পি এইচ ডি করার সুযোগ পান যোগেশ সাক্সেনার মতো বিখ্যাত প্লাসমা বিজ্ঞানীরা। তাঁদের কথায় বিভাদেবীর সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল অত্যন্ত সুখকর। পি আর এলে বিভাদেবীর সময় কাল সম্বন্ধে আমরা তাঁর ছাত্র সাক্সেনার কাছ থেকে জানতে পারি। বিভাদেবী পি আর এলে উচ্চ গতি পদার্থবিদ্যা পড়িয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রদের ধারণা ছিল তিনি

খুব কঠোর মহিলা। কিন্তু সাক্সেনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এর উল্টো কথাই বলে। তিনি সাক্সেনাকে ফরাসি ভাষা শেখার জন্যে সাহায্য করেন। এছাড়াও শুধু গবেষণা ছাড়া অন্যান্য পড়াশুনা করার কাজে সাহায্য করতেন। পি আর এলে কাজ করার সময় তিনি কোলার স্বর্ণ খনিতে প্রোটনের ভাস্কনের ওপর গবেষণা করার জন্য সুযোগ পান। কিন্তু পি আর এলে কাজ করার সময় তিনি লিঙ্গ বৈষম্যের স্বীকার হন। রাজিন্দর সিংহ ও এস সি রায় তাঁদের বইয়ে বলেছেন “কোলার স্বর্ণ খনিতে বিভা চৌধুরীর কাজ সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নেই।” অথচ সাক্সেনার কথার থেকে বিভাদেবীর সক্রিয় অংশগ্রহণের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। কোলার স্বর্ণ খনির প্রকল্প ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি মাউন্ট আবুতে এক নতুন প্রকল্প হাতে নেন। এ নিয়ে বিক্রম সারাভাইয়ের সাথে তার কথা হয়। কিন্তু এরপরেই পি আর এলের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কিছু পরিবর্তন ঘটে ও বিভাদেবীর প্রকল্পের সমাপ্তি ঘটে।

সেখান থেকে স্বেচ্ছাবসর নেন এবং তারপর চলে আসেন কলকাতায়। সেখান থেকে সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন আমৃত্যু। আজীবন বিজ্ঞানের পূজারী বিভাদেবী বিবাহ করেননি এবং শেষ দিন পর্যন্ত গবেষণা করে গেছেন। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর ১ বছর আগেও তিনি এক গবেষণাপত্র বার করেছেন।

সারাজীবন মূলত অন্ধকারে থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুর পরে কিছু সম্মান পান তিনি। আন্তর্জাতিক অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন তাঁর নামে একটি তারার নাম রাখে বিভা। তিনি একমাত্র ভারতীয় মহিলা যিনি এই সম্মান পেয়েছেন।

1. Indian Journal of History of Science, 53.3 (2018) 356-373 <[https://insa.nic.in/writereaddata/UpLoadedFiles/IJHS/Vol53\\_3\\_2018\\_Art10.pdf](https://insa.nic.in/writereaddata/UpLoadedFiles/IJHS/Vol53_3_2018_Art10.pdf)>
2. Bibha Chowdhury : A life spent in chasing cosmic rays <<https://www.getbengal.com/details/bibha-chowdhury-a-life-spent-in-chasing-cosmic-rays>>
3. Bibha Chowdhuri <<https://medium.com/sci-illustrate-stories/bibha-chowdhuri-c7c48792d2b1>>
4. (Dr.) Bibha Chowdhury- Truly a star! <<https://chinmaye creations.com/2022/04/02/dr-bibha-chowdhury-truly-a-star/>>
5. Bibha Chowdhuri-The First Woman Scientist at the TIFR <[https://www.tifr.res.in/~ipa1970/news/2021/JanJune/05-S\\_C\\_Roy\\_R\\_Singh Vol51\(1-2\).pdf](https://www.tifr.res.in/~ipa1970/news/2021/JanJune/05-S_C_Roy_R_Singh Vol51(1-2).pdf)>
6. Bose, D M, Chowdhury, B. origin and nature of heavy ionisation particles detected on photographic plates exposed to cosmic rays, Nature 147(1941):240-241
7. Bose, D M. Chowdhury B. A photographic method of estimating the mass of a mesotron, Nature 148(1941):259-260
8. Bose, D M, Chowdhury B. A photographic method of estimating the mass of a mesotron, Nature 149(1942):302
9. A jewel unearthed : Bibha Chowdhury, Rajinder Singh and S C Roy

# INSTINCTS

Sovik Roy

Nature is diversified, human nature is more diversified. This diversity in human nature shows more precision when we compare (say) two or more humans with respect to a fixed profession. Sometimes these diversified behaviours are very hilarious. I came across this aspect of human nature in research profession too. Now as I am writing this article, this is tickling my funny bones.

Charles Darwin, in his ‘Origin of Species’ described many instances of peculiarities among plant and animal kingdoms. One such which grabbed my attention, and which I am going to correlate with my objective of this article, is the following. Darwin talked about slave making instincts of ants. This remarkable instinct can be observed in various types of ant species, specifically in *Formica (Polyerges) rufescens* and *Formica sanguinea*, which are the two protagonists of my present article. The significant difference between these two communities are as follows.

*F. rufescens* (FR) is completely dependent on slave ants from its own community. The slave ants determine the lifestyle of FR. FRs don’t build their own nest, don’t determine their own migration (which is part and parcel for survival), don’t collect their own foods and cannot even feed themselves. Their slave ants do the above activities for the masters. On the other hand, *Formica sanguinea* (FS) have a limited number of slaves. In this case, the masters determine when and where a new nest will be built; when and where to migrate. During migration, FRs are carried by their slaves while FSs carry their

slaves. When FRs’ are not given access to their slaves, the masters don’t survive whereas in the FSs’ community, the slaves are sometimes mingled with their masters, leaving the nests and marching towards survival together.

In my research career, I also saw, and that I can remember now, *F. rufescens* and *F. sanguinea* supervisors. To me *F. rufescens* master is that person, who though once was active in his area of expertise, is now exhausted with ideas. So he looks forward to his scholars to publish papers. He asks his students to look for a new idea. The scholars search in archive, migrate to a new sub-branch if needed. During this process they convince their master and put him into the new shoes so that they can quickly fill their dry lands with drinkable water. But if the scholars physically migrate somewhere else, the master doesn’t survive. But this never happens as *F. rufescens* master makes many slaves. *F. sanguinea* supervisor, on the other hand, takes very few students under his umbrella and he is happy with that. Because this type of supervisor builds his own domain of interest, he attends colloquiums and seminars and he determines whether any sort of migration is at all needed for his scholars. So scholars of *F. sanguinea* community live a happier and worry-free life than those of *F. rufescens*’ whereas *F. rufescens* community scholars are more hardworking than those of *F. sanguinea*’.

Now as you are reading my article, try to find out which community you belong to!



# ভুলেও না ভোলার গল্প

শুভদীপ চক্রবর্তী

## ১) ব্যাণ্ডের ডাক

দিদির কিছু মনে থাকে না। তবে পুরোনো দিনের কথা যেন আরো বেশি করে মনে পরে ওর। ডাক্তার বলেছে এটাই ওর ব্যারাম। স্মৃতিশক্তি লোপ পাচ্ছে। ছোটবেলা বা তার পরের বয়সের কথা মনে থাকলেও, বাকি সব ভুলে যাবে ও ধীরে ধীরে।

আমার বাড়ি মালবাজার থেকে তিন কিলোমিটার বাইরের দিকে। আমার বয়স বাষটি, দিদির সত্তর। কাঠের দোতলা বাড়িটা বাবার তৈরি। আমি অবিবাহিত; মালবাজারের একটা কাপড়ের দোকানের কর্মচারী গত চল্লিশ বছর ধরে। দিদির বিয়ে হয়েছিল কলকাতায়। ওদের অবস্থা ভালোই ছিলো। একমাত্র মেয়ে বিয়ের পর বিদেশ চলে গেল বরের সাথে। জামাইবাবু বছর দশেক আগে স্ট্রোকে মারা যায়। তারপর আর কি? দিদি একাই থাকতো বাড়িতে।

কাজের লোক দিদির চালচলন লক্ষ্য করে মেয়েকে জানায়। ডাক্তার দেখানো হলে ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটা জানা যায়। তারপর জামাই এসে বাড়ি বিক্রির বন্দোবস্ত করে দিদির বিদেশ যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। দিদি কলকাতাই চিনছিলো না, বিদেশ যাবে কি। এটা অবশ্য আমার ভাগ্নি আর ভাগ্নি জামাই এর ভালোই জানা ছিলো।

জামাই বাবাজীবন দিদির গত পরশু আমার কাছে রেখে বিদেশ যাত্রা করেছেন।

আমার কিন্তু দিদির অস্বাভাবিক লাগছে না। ও শুধু আমাকে বলছে আমার মাথার চুল এত পাকলো কিভাবে।

আমাদের বাড়ির আশপাশটা গত চল্লিশ পঞ্চাশ বছরে খুব বেশি একটা বদলায় নি। দিনের আলোয় আশপাশের দোকানগুলো দেখা গেলেও রাতের অন্ধকারে বাড়িটা আবার সময়কে পিছিয়ে দেয়। বাড়ির পেছনের দিকে একটা পুকুর আছে কিছু গাছে ঘেরা। তারপর আছে কয়েক টুকরো চা বাগান। বৃষ্টি হলে পুকুরটা কানায় কানায় ভরে যেতো। চা

বাগানের ঢালু জমি থেকে কয়েকটা জলের রেখা পুকুরে এসে মিশেছে। বৃষ্টি হলেই ব্যাঙ ডাকতো। জানালার পাশের খাটে দিদি পড়তে বসতো হ্যারিকেন নিয়ে। ব্যাঙের ডাক শুরু হলেই আমি দিদির কোলে মাথা দিয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পরতাম।

আজও বৃষ্টি হচ্ছে। দোকান থেকে তাড়াতাড়ি ফিরেছি আজ। দিদির সারাদিন দেখার জন্য যে মহিলা থাকে সেও চলে গেছে। দিদি হঠাৎ বললো, “বৃষ্টি হচ্ছে ভাই। ব্যাঙ ডাকলো বলে। কি করবি তখন?”

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলাম।

“আমার বই খাতা গুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করিস কেন বলতো? খুঁজে পাচ্ছি না।”

“আমিও খুঁজবো দিদি।” বললাম।

কিছুক্ষণ চলার পর বৃষ্টি একটু কমলো। টিনের চালের বামবাম আওয়াজ মৃদু হয়ে প্রায় মিলিয়ে গেল। ব্যাঙের ডাক শুনতে পেলাম।

দিদি আমার দিকে তাকালো। খিলখিলিয়ে হাসছে ও।

ঘরের এল ই ডি বাস্টাকে হঠাৎ হ্যারিকেনের বাতি মনে হলো আমার।

“উরি বাবারে!!” বলে এই বয়সেও এক লাফে খাটে উঠে দিদির কোলে মাথা দিয়ে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পরলাম।

“আরে পাগলা রে..” দিদি হাসতে হাসতে আমার মাথায় হাত রাখলো।

ভুলে যাক ও মাঝের সব কথা। আবার একসাথে বড়ো হবো আমরা।

## ২) নিমকি

শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। জ্বর জ্বর ভাব। দোকানের ঝাঁপ ফেলবো ভাবছিলাম। মতিপুর বাজার থেকে মাইল দেড়েক দূরে রাস্তার পাশে আমার ছোট একটা মিষ্টির দোকান। পেছনে বাড়ি। রাত আটটা বাজে। ঠাণ্ডা গ্রামের দিকে

একটু বেশিই। টিপটিপ বৃষ্টিও পরছে বাইরে। খন্দের নেই এখন, তাই রাস্তার ওপাশে হ্যালোজেনের আলোতে বৃষ্টির ফোঁটা দেখছিলাম।

গণেশ মিস্ত্রী ভাঙার। নামটা ঠাকুরদার। দোকানটা খুলেছিলো বাবা। চালাই এখন আমি। মিস্ত্রীর দোকান হলেও আমাদের কাটা নিমকিটা চলে সবচেয়ে বেশি। গ্রামের সবাই খুব সুনাম করে। বাবাই বানাতে আগে, আমি দেখে দেখে শিখেছিলাম। বাবা ধরতে দিত না। অসুখ ধরার পর সব বদলে গেল। ভুলে যাচ্ছিল সব কথা। কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার কি কি যেন টেস্ট দিলো। রিপোর্ট দেখে কি বললো ডিয়েমসিয়া না ডিমেনশিয়া কি একটা হয়েছে। বললো এমনি চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু ভুলে যাবে কথা।

বাবা দোকানে আসে না। ঘরেই বসে থাকে। মা আর বোন আছে ঘরে। ওরা দেখে রাখে। আমি দোকান দেখি।

যাই হোক। দোকান বন্ধের মুখে তিনটে বড়ো সাদা গাড়ি এসে দাঁড়ালো দোকানের সামনে। মাকের গাড়ি থেকে ছাতা মাথায় যিনি নামলেন তাকে চিনি। এম পি আমাদের। সাথে আরেক বাবু। আর সাজপাঙ্গ।

“এ ভাই, তোমার দোকানের নিমকিটা নাকি হেব্বি? তরুণ বলছিল” এম পি সাহেব বললেন।

তরুণকে চিনি না।

গায়ের চাদর থেকে হাত বের করে নমস্কার করে বললাম, “ওই আর কি স্যার, আপনাদের আশীর্বাদে।”

“শোনো, আমার এই দাদার মেয়ে, আমার ভাইবী বিদেশ থেকে ফিরেছে। সামনে বাগান বাড়িতে কাল প্রোগ্রাম আছে সেজন্য। ও দেশে এসব নিমকি টিমকি পায় না। মা আমার ঘিয়ে ভাজা কাটা নিমকি খেতে চেয়েছে আমার কাছে। সকালে আরো লোকজন আসবে। পার্টির লোক আছে, আমলা আছে, পুলিশ আছে। মিস্ত্রীর প্যাকেট কলকাতার। ভাবছি এখনকার নিমকি খাওয়াবো সবাইকে। কলকাতার লোকের আবার গ্রামের ফ্লোভার খুব ভালো লাগে, হে হে। শ খানেক লোক ধরো। হিসাব মতো বানিয়ে দিয়ে এসো। এই হাজার রাখো।”

আমি চুপ করে থাকলাম। এমনি কাস্টমার ফেরানো যায়। কিন্তু একে ফেরাই কি করে? গাড়ি ধোঁয়া উড়িয়ে চলে গেলো।

ঘড়িতে আটটা কুড়ি। দোকানে নিমকির কাঁচামাল শর্ট। কাল আনবো ভেবেছিলাম।

বোনকে খবর দিয়ে সাইকেল বার করে মতিপুর বাজারের দিকে ছুটলাম। বৃষ্টির ফোঁটা গুলো তিরের মতো বিঁধছে। কোনোরকমে মাল তুলে বাড়ি ফিরলাম। সমস্যাটা বাঁধলো আরো বেশি তারপর। প্রচণ্ড কাঁপুনি দিতে লাগলো শরীর। বুঝলাম লক্ষণ ভালো না। বোনকে চিৎকার করে ডাকলাম। কাজ শুরু করবো ভেবেও পারলাম না। বোন কপাল ধরে বললো, “গা তো আগুন হয়ে আছে রে।”

কোনো রকমে ঘরে গিয়ে শুয়ে পরলাম। চোখ বোজার আগে দরজার দিকে একবার চোখ গেছিলো। দেখলাম চাদর জড়িয়ে একগাল সাদা দাড়ি মুখে রোগা একটা শীর্ণ মানুষ তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বাবাকে অচেনা লাগে এখন।

ঘুম ভাঙলো সাড়ে আটটার পর। বোন বসে ছিল পাশে।

“জল পট্টি দিয়েছিল মা। আর রানুদের বাড়ি থেকে একটা জ্বরের ওষুধ এনেছিলাম। এখন জ্বরটা একটু কম লাগছে।”

নিমকি।

একলাফে উঠে পরলাম। দোকানের দিকে দৌড় দেবো ঠিক করেছি, বোন বললো, “এই দাঁড়া। আমিও যাচ্ছি।”

বাবাকে দোকানে অনেকদিন পর দেখলাম। কাঁধে গামছা। নিমকি ভাজা শেষ। ভাজা শেষে বাবা চামচে করে গাঁওয়া ঘি নিয়ে নিমকির উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে। ঠিক যেমন ঠাকুরের চোখ আঁকা হয়।

“কাল রাতে আমি, মা আর বাবা জোগাড় করে রেখেছিলাম। আজ ভোরবেলা থেকে উঠে বাবা কাজ ধরেছে।” বোন বললো।

বাবা মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো। একচিলতে হাসলো। অদ্ভুত সেই হাসি। তারপর মাথা নামিয়ে কাজ করতে লাগলো।

মনের উষ্ণতা শরীরের উষ্ণতাকে ছাড়িয়ে গেছিলো। জীবনে অনেক কিছু বদলাতে দেখেছি। বাবাকেও বদলে যেতে দেখেছিলাম। আজ প্রথমবার ভগবানকে বদলাতে দেখলাম।



## ইচ্ছেপুরণ

অরুণ কুমার দাস

সেপ্টেম্বরও শেষ হতে চলল, অথচ এই তিন-চার দিনের নিম্নচাপের বৃষ্টি শরৎকালকে যেন বর্ষাকাল বানিয়ে ফেলেছে। শুক্রবারটা ছুটি থাকায় শনি-রবি মিলিয়ে তিনদিনের ছুটি পেয়ে কলকাতা থেকে বাড়ি এসেছে ঝিলাম। দুপুরের খাবার শেষে মা আর ভাইয়ের সঙ্গে বারান্দায় বসে একটা বাংলাদেশের নাটক দেখছিল সে। ওদিকে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে, থামার যেন কোনো লক্ষণই নেই। এমন বৃষ্টির দিনে সবার সাথে একসঙ্গে বসে নাটক দেখার মজাই আলাদা। হঠাৎ ঝিরি ঝিরি থেকে মুঘলধারে বৃষ্টি শুরু হল। তাদের টিনের চালের ওপর টিপটিপ বৃষ্টির শব্দ এবার বাম বাম করে পড়ছে। বাম বাম আওয়াজে নাটকের কোনো কথাই আর শোনা যাচ্ছে না। অগত্যা, তাদের নাটক দেখা ভঙ্গ হল। মা আর ভাই ঘরে চলে গেল। বারান্দায় ঝিলাম এখন একা। সে বৃষ্টি উপভোগ করছে। সেই কতদিন হলো এমন করে সে বৃষ্টি উপভোগ করেনি। শহরের যান্ত্রিকতা, নিত্যদিনের কাজের চাপ আর কেরিয়ারের অনিশ্চয়তা তাকেও যেন রোবট বানিয়ে ফেলেছে। নাহ্, আজ সে ইচ্ছেপুরণ করবে। অন্তত আজকের দিন সে ঘড়ির কাঁটার নিয়মে চলবে না। যতক্ষণ খুশি বৃষ্টির সাথে সময় কাটাবে। তার আর বৃষ্টির মধ্যে কতদিনের কত কথা যে জমা আছে। বৃষ্টির ফোঁটা টিনের চালে বাম বাম আর উঠোনের মাটিতে ঝপ ঝপ ঝরে পড়ার শব্দ সে মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে শুনছে। এর সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ব্যাঙের গো গো ডাক। ওদিকে ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ আর বৃষ্টির শীতল স্নিগ্ধতা তার শরীর ও মনকে সিক্ত করে দিচ্ছে। ঝিলাম প্রকৃতি-প্রেমিক। সে যেন প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ অন্যদের থেকে বেশি অনুভব করতে

পারে। এমন করে যে কতক্ষণ কেটে গেলো তার খেয়াল হলো না। হঠাৎ মায়ের ডাকে চকিত ফিরলো। এখন বৃষ্টি থেমে গেছে। মা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো, “এমন উদাস হয়ে কি এত ভাবছিস? এদিকে আয় চা বানাবো এখন”। চা-মুড়ি খেতে খেতে মা বলছিলো, “আর দুবছর পর তোকে বিয়ে দেবো। নতুন বউয়ের হাতে সংসারের ভার তুলে আমি নিশ্চিন্ত হব। তার আগে আমাদের ঘরটা বানাতে হবে।” ঝিলাম প্রতিবাদ করে বলল, “ঘরতো আমরা বানাবই, তবে বিয়ে এত তাড়াতাড়ি নয়, আগে একটা চাকরি-বাকরি হোক”। মা আরো বললো, “দেখতে শুনতেও তো সময় লাগে, তোর ওখানে কাউকে ভালো লেগেছে নাকি? ভালো লাগলে কথা বলে রাখিস”। ঝিলাম এবার বলল, “আরে ওখানে বেশি মেয়ে নেই, যারা আছে প্রায় সবাইই আগে থেকে ঠিক করা আছে। সব বড় লোকের মেয়ে তাদের লাইফস্টাইলই অন্যরকম। আর তাছাড়া ওখানে অন্য অনেক স্মার্ট ছেলে থাকতে তারা তাকে পছন্দই বা করবে কেনো?” যাই হোক মাকে একটু হলেও বোঝানো গেলো। পরশুদিন দুপুর নাগাদ সে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল। বাড়ি থেকে অনেকটা পথ মা তাকে এগিয়ে দিতে এসছিল। এখন নিম্ন চাপ বিদায় নিয়েছে। রোদ ঝলমলে দিন, শরতের নীল আকাশে আবার পেঁজা তুলোর মত মেঘের দেখা। পথে খ্রিস্টানদের কবর স্থানটাতে কাশ ফুল ফুটেছে খুব, ছাতিম ফুলের উগ্র গন্ধও বাতাসে ভেসে আসছে। ট্রেনের জানালা থেকে সে খেয়াল করেছিল অনেক জায়গাতেই পুজোর প্যাণ্ডেল বানানোর কাজ চলছে জোরকদমে। এবার বেশ বোঝা যাচ্ছে পুজোর আর বেশি দেরি নেই।



# BECKONING THE CAT

Poonam Kumari

On their way back from school, as they approached Mr Lal's house, Saloni asked her younger sister Deepti "Should I go in now?". "We are already late, let's come back later" replied Deepti. When they reached home, Saloni reminded Deepti not to tell anyone of the incident at school today.

As soon as they entered the house, they heard Dadi shouting. She was in a foul mood again. Was it something Maa did, or they, was not clear yet. "I had the key all the time with me!" dadi muttered to herself. As they went into the kitchen, Maa told them "the cat destroyed the cream again. Ghee was also open. We had to throw away everything". Everyday dadi kept cream from the milk in a container and lock it in a cupboard, after two or three days when there was enough cream stored, she made ghee out of it. No one was allowed to have the ghee or any of the other treats like murabbas and laddoos without her permission. She gave one or two pieces sometimes to Deepti and Saloni, but most of it was sent to their uncle's house who lived with his wife in a town few hours from theirs. Ever since the news came that Ritu aunty was pregnant, Dadi has been making more murabbas and mathris. But for the past six months, exactly since the time Saloni discovered that the key to the terrace can open dadi's cupboard, every now and then marks of the size of small fingers and shape of a cat's claws were found on the cream, never eaten though, just left unusable.

On any other day Saloni would have watched her steps, but today, she had other pressing things in mind than to worry about dadi's foul mood. After lunch, while she was doing the dishes, hesitantly she asked her mother who was feeding her one-month-old brother, "Can I have ten rupees, I have to buy drawing charts for school". She regretted the choice of purchase as soon as she said it. Mother replied without looking up

"you know I don't have any money with me, ask your father when he gets home." Plan A seemed to be failing. Saloni had to rely on other alphabets, She needed a new plan quickly.

Their father worked at the post office. Raju's father was the postmaster there. Today in school Raju made fun of her faded school dress and unevenly breaded hair. Yesterday it was her old shoes and the day before was her old bag. At lunch she had enough of his bullying and decided to take matters into her own hands only to let go when Raju threatened to complain to his father while his head was pressed against the wall and hands behind his back. She did not think this through. They spent all of biology class negotiating the terms of her punishment using paper chits. The agreed upon solution was for her to fetch his cricket ball from Mr. Lal's yard, which he lost last week. Saloni's plan A was to buy a new ball and declare it being rescued.

Mr Lal's house was close to theirs. The only problem was that it was considered haunted, as a result they were not allowed to go anywhere near it. No one lived there and no one ever went inside. People often claimed they heard noises from inside.

Saloni's main concern was not the ghost but the lack of time. Raju gave her time till tomorrow morning before morning assembly. After doing the dishes and cleaning the kitchen she would have about twenty minutes left before father would come back, and in that time, she had to go in the yard, look for the ball and get back home. All of this was possible, if dadi did not ask them to do anything else. Refusing dadi's orders would be another chapter to deal with. And sure, enough as soon as she finished cleaning the kitchen, dadi came with a basket of raw mangoes, handing a knife to her, she began peeling them for pickle.



“Can I do it later, please ? I want to go out and play”

“You are thirteen now! You need to learn this, your mother-in-law will complain, once you get married that we didn’t teach you anything!”

Please dadi, please let us go for just half an hour, we will help you catching the cat” pleaded Deepti. Knowing her dadi and her luck, Saloni picked up the knife. She shrugged thinking of the humiliation at school and scolding at home the next day. Slowly, she began peeling the mangoes.

“Alright just this once, and only for half an hour also you have to find the cat” said dadi.

“At least for a month now the cat should not, destroy anything Deepti said with a smile to Saloni as they walked towards Mr. Lal’s house. They could not believe their luck. Last time dadi was this generous on Kumari Puja six months back when mother went to the city to see the doctor when she was pregnant with her younger brother. She gave fifty rupees to all the nine girls who were there for kumari Puja. That day all the food was prepared by her in ghee. She was very anxious all day until Maa came back. That night after dinner when the electricity in their phase was out and the entire family was on the terrace Dadi gave them the key to the cupboard for the only time ever, and asked them to bring ladoos for everyone. Even with the lamp in the hand Deepti refused to walk in the front. Saloni was not afraid of darkness, so she walked ahead without the lamp. When they got down, she put the key on the table to fill kerosene in the lamp and accidentally took the wrong key to open the cupboard. Both sisters were delighted when they discovered the mix-up of the keys.

As they reached Mr. Lal’s house, they began discussing the strategy to rescue the ball. It was decided that Deepti would stand outside, and Saloni would go in. If Father or anyone else was seen Deepti would start singing and go home. Saloni was supposed to hide until Deepti came back. Saloni jumped the fence and began looking for the ball. There was an old chair in the lawn made of cement covered with dust. Saloni resisted the urge to write her name on it. The clock was ticking, and she did not know where to begin.

As she approached the porch, she heard some noise coming from behind the house. Clutching her hand, she moved slowly towards the back of the house, trying to be as quiet as possible. There was a small, shaded space with shelves on the wall. She waited for a few seconds trying to hear Deepti singing, then moved closer to the shelves. Beside the shelves were some bricks. A pair of round black small eyes was staring at her from behind those bricks. For a second, she stood frozen out of surprise rather than fear. It was a black cat. Beside the cat was the green cosco ball. The struggle to get the cat out of the way went for a few minutes as she tried shooing her away with stones. Finally, she remembered the piece of murabba in her pocket and that did the trick. Holding the ball as she emerged victorious, Saloni hugged Deepti. They completed their mission in less than fifteen minutes. On their way back Saloni told Deepti about the cat and the fun they would have describing the cat to Dadi.

By the time they reached, father was already home. He was having tea sitting beside Dadi who was cutting the mangoes. Maa was feeding their brother. Saloni quietly picked up a knife and began cutting the mangoes, while Deepti began playing with her brother’s feet.

“I will go with them tomorrow”, said father. Saloni looked questionably towards her mother.

“To the doctor, to find out if Ritu aunty is having a boy or a girl” replied Maa

“We can know about it ?” asked Deepti with a surprise.

Maa nodded in consent, “We did for him, remember on Kumari puja, when we went to the doctor” said mother patting her brother.

“Yeah, it is better to find out in the beginning when we can do something about it” said Dadi collecting the pile of mangos which can’t be used for pickle in a plastic bag. Giving the bag to Saloni, she indicated it to be thrown away. Saloni took the bag full of *unwanted* mangoes and walked to the door. She glanced back at her brother on Maa’s lap. The evening sun was illuminating the doorway. As she stepped outside in the bright light, Saloni was scared for the first time.



# আমি গল্প লিখেছি

সুদীপ চক্রবর্তী

আচ্ছা গল্প লেখার জন্য কি কি প্রিপারেশন নিতে হয়? বিশ্বাস করুন আমি বাংলাতে ভালো মার্কসই পেয়ে এসেছি ছোটবেলা থেকে। হঠাৎ কাল যখন ভাবলাম এইবার ম্যাগাজিনের জন্য একটা বেশ জব্বর দেখে গল্প লিখবো, লোককে বুঝিয়ে দেবো ‘আমিও পারি’, প্রাথমিক ভাবে একটা আনন্দ-উচ্ছাস ছিল, যেটা আজ হতাশায় পর্যবসিত হয়েছে। এখন মনে হয় বেশি গল্পের বইও আমি পড়িনি, আর যতটুকু যা পড়েছি সেইটা নিতান্তই পাঠক হিসেবে, সেখান থেকে নিজে থেকে কিছু ভালো লেখার রসদ জোগাড় করতে পারিনি। তাই লেখার বিদ্যে গড়ে ওঠে নি। খালি মনে মনে উড়েছি অলীক সুখে। এতদিন মনে হত আমি যদি কোনো গল্প লিখি, তাহলে ফাটিয়ে দেবো একেবারে। মানুষজন দেখে চমকে যাবে, বাহবা দেবে। এখন বুঝি, এত সহজ নয় চাঁদু, পেটে এলেম থাকতে হয়, যেটা তোমার নাই, আর খালি বাংলায় নাম্বার পেলে হয় না। তবু ভাবলাম যাহোক একটা লিখবো, শিল্প বানাতে গেলে শিল্পী হতেই হবে এমন তো কেউ মাথার দিবি দেয়নি, না হয় মান অত ভালো হবে না। কিন্তু কি জানেন, হলো না আমার দ্বারা, আমি পারলাম না। তাই ভাবলাম এই গল্প না লিখতে পারার অভিজ্ঞতাটাই একটু শেয়ার করি সবার সাথে।

প্রথমে কিরকম ধরনের একটা চিন্তা এল। আগে পটভূমিটা একটু বিস্তারে বলা যাক, আসলে এই পটভূমি এবং অপ্রয়োজনীয় কিছু ফিরিস্তি না লিখলে লেখাটা নিতান্তই ছোট হয়ে যাবে। জীবনে আমি যে দুটি বই বাড়ির বাকি সবার সামনে পড়তে লজ্জা পেয়েছি, তাদের একটা হল টুয়েলভের বায়োলজি, ওই হিউম্যান রিপ্ৰোডাকশন চ্যাপ্টারটার জন্য আর এক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘প্রেমের গল্পসমূহ’। প্রথমটাতে আমার অত রস লাগেনি, বায়োলজি আমার খুবই অপছন্দের সাবজেক্ট। কিন্তু দ্বিতীয়টাতে হেবির রস। সিধা কথায় বললেন গল্পগুলোর লেখার বাঁধন যেমন সুন্দর, তেমনই সাবলীল এবং প্রাজ্ঞ। আর উপরি পাওনা হিসেবে সেই গল্পগুলোতে একটা সুরসুরি ছিল যেটা সেই

বয়সে আমার মতো অকালপক্ক নাবালকের কাছে খুব আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। সেই বয়স থেকেই চাইতাম আমি প্রেমের গল্প লিখবো কোনোদিন, বড় হবার পর। তখন ছোট, ঠোট টিপলে ভুঞ্জনেতে খাওয়ানো ভাত বেড়িয়ে যাবে। আর তখন লিখলে মা নির্ঘাত ভাবতো আমি লেডি ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি। তাই প্রেমের গল্প লেখার চিন্তাটা সেই বয়সে প্রথমই বাদ। আর এই সময়ে এসেও, প্রথমে ভেবেছিলাম লিখবো না, কারন ইনস্টিটিউটের বাকি বন্ধুরা যখন সেটা পড়বে ভালোরকমের একটা খিল্লি হবে। মনে আছে স্কুলে পড়ার সময় এক দাদা এবং এক দিদি প্রেমে রীতিমতো হাবুডুবু খাচ্ছে; রোজ টিফিনের সময় আমাদের যে বিন্ডিংটার দোতলায় ক্লাসরুম ছিল, তার ঠিক নিচে একটা কোণে গায়ে গা ঘেঁষে তারা আড্ডা দিত। আমার অকালপক্ক মনে খুব উৎসাহ ছিল ওরা কি কথা বলে তা জানার। অনেকবার পাশ দিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়েছি, কিন্তু এতোটাই আস্তে কথা বলতো ওরা, কোনোদিন শুনতে পাইনি। য়েবার চুপিচুপি ওদের কথা শুনতে গিয়ে ধরা খেয়েছিলাম বিশাল খিল্লি হয়েছিল, দিদিও কার কাছে সে কথা শুনে বাড়িতে ডিনার করার সময় সবার সামনে বলেছিল, “মা জানো, ছোটকা কাল প্রেম করা দেখতে গেছিল।” পুরো প্রেস্টিজের ওপর দিয়ে রোলার চলে গেছিল। যার কনসিকুয়েন্সে আজও আমি এই জিনিসগুলো থেকে দূরে থাকি। তবুও একটু সাহস জোগালাম, ভাবলাম লিখতে তো দোষ নেই, আমার প্রতিভা সম্বন্ধে জ্ঞান হয়ে যাবে; লেখা নাইবা দিলাম ম্যাগাজিনে। কিন্তু পারলাম না, যারা কখনও প্রেম করেনি জীবনে তারা আর কি করে লেখায় ইমোশন আনবে, ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, তার মাঝে মোশনের তাগিদে এতোবার বাথরুম ছুটলাম, এতো পায়চারি দিলাম, মাঝে কয়েকবার মনে মনে ইনস্টিটিউটের কাপলগুলোর কথা ভাবলাম, ওরা কি কি করে, কিভাবে থাকে। তবু পেন থেকে কালি বেরলো না। সবশেষে ফ্রাসট্রেটেড হয়ে এই প্রচেষ্টায় ইতি টেনে মন শান্ত করতে বিরিয়ানি অর্ডার দিলাম।

আগের চেষ্টায় ইতি টানার পরে এবারে যেটার টার্গেট ছিল, সেটা হল গোয়েন্দা গল্প বা বলা ভালো সত্যাত্মক গল্প, ব্যোমকেশ যেমন বলে। এই বিষয়ে আমার ফিলিং ছিল এরকম, ‘আমি এক্সপেরিয়েন্সড’, কারণ ফেলুদা, ব্যোমকেশ, কিরীটি, শার্লক হোমস- চার জনের সাথেই আমার পাঠক হিসেবে পরিচিতি ছিল, এদের খুব ভালবেসে পড়েও ছিলাম। দুর্গরহস্য বা হাউন্ড অফ বাস্কারভাইলস এই সেরা সেরা লেখাগুলো মনে মনে আমাকে গোয়েন্দা বানিয়ে তুলেছিল। কিন্তু এককিছুর পরে যখন লিখতে শুরু করলাম, সেই প্রচেষ্টাটা যে আমাকে নির্ভুর বাস্তবটা চিনিয়ে দেবে, আমি ভাবিনি। শুরুতে একটু ঢং দেখালাম, প্রথম লাইন শুরু করলাম একটা ফোন কল দিয়ে।

...“হোয়াট? কি করে হল?”

তারপর কটা চরিত্রের পরিচিতি, একটা খুন, বাকিটা ছন্দ না মেলার ইতিহাস, পরিশেষে হতাশা এবং অসফলতার দরুন নিজের গুণ্ডী সম্বন্ধে এক করুন উপলব্ধি।

শিবরাত্রির দিন ইনস্টিটিউট থেকে বাড়ি এলাম। তখনও মাথায় গল্প লেখার পোকা কিলবিল করছে। দিদি তখন সাজছে। দিদিকে বললাম,

— দিদি একটা কোনো কনসেপ্ট বলনা যেটা নিয়ে গল্প লেখা যায়।

— আজ আবার কার ভূত চাপলো মাথায়, রবীন্দ্রনাথ নাকি বিভূতিভূষণ? আচ্ছা বুঝলাম, ওই ম্যাগাজিন তাইতো। তা শিবরাত্রি নিয়েই লেখনা, কত লোক খাবে, বাবাই তো পূজো করছে। নিজের গ্রামকে ভালো করে তুলে ধর, এখানকার রীতি রেওয়াজ; শহরের থেকে কিভাবে আলাদা।

— খরাপ না; কিন্তু কি যে লিখি। কঠিন হয়ে গেলনা টপিক টা। আর শহরের মানুষ জন শিবরাত্রির সাথে নিজেকে রিলেট কি করে করবে।

— হ্যাঁ রে, তোদের ইনস্টিটিউটের বাইরে কেউ ওই ম্যাগাজিন পড়বে? ইনস্টিটিউটের বেশিরভাগই তো গ্রামসাইড থেকেই উঠে এসেছে। তা এটা যদি না হয়, পপুলার কিছু চাইলে, মা ঠাকুমার ঝগড়াটাকেই গল্প বানিয়ে দে, এই ঝগড়াতে তো আর গ্রাম শহরের অ্যাঙ্গেল নেই, যেখানেই মানুষ সেখানেই ঝগড়া, পি এন পিসি। লাগলে আজ কটা সিরিয়াল দেখে নে। আর এই কথাটা রাখিস কিন্তু “সংসারে শান্তি আছে, অশান্তি চাই, শাশুড়ি-বৌ মিলে বাংলা সিরিয়াল দেখুন, এক মাসের মধ্যে অব্যর্থ ফল”।

— তুই বেসনই মাখ। ইয়ার্কি মারছে তখন থেকে। খুব

সখ না শিবরাত্রি করার। মেয়েরা কেন করে শিবরাত্রি? আমাদের জন্যই তো। আর তুই আজই আমার সাথে ইয়ার্কি মারছিস। দাঁড়া হচ্ছে তোর।

— খুব পেকেছিস তো। খুব খুব।

— ইউরেকা পেয়ে গেছি। আমি লিখব ভেন্ডিলোকুইজম নিয়ে।

— ও ওই সত্যজিৎ রায়ের ‘ভূতো’ কপি ক্যাট কোথাকার।

— দূর বাবা, আমি ওই গল্পটা কেন লিখব, অন্য কিছু লিখবো। তুই না বড্ড ঝগড়ুটে আছিস।

— তবে, মা দেখোনা ছোটকা গাল দিচ্ছে।

একটু বকা খেলাম অতঃপর। যাক লিখতে শুরু করলাম ভেন্ডিলোকুইজম নিয়ে, কিন্তু সেই পেটে বিদ্যের অভাব। তারপরে বিশ্লেষণে গেলাম, গল্প মানুষ কি করে লেখে? একটা ফ্লোচার্ট বানালাম নিজের মতো, প্রথমে একটা কোনো কিছু থেকে ইন্সপায়ার্ড হতে হবে, যেমন প্রকৃতি, প্রেমিকা, কোনো সিনেমার দৃশ্য, বাস্তবজীবন, নিজের লাইফের অভিজ্ঞতা, বা কোনো উপন্যাস। তারপর সেই ইন্সপিরেশন থেকে একটা স্কেচ বানাতে হবে মনের ভিতর, যেটাই কাহিনির সারমর্ম; যেন একটা জীবন্ত ছবি ভেসে ওঠে মনে মনে। তাহলেই অর্ধেক কাজ শেষ। তারপর সেটাকে মনের থেকে নামাতে হবে খাতায়, দৃশ্যপট থেকে শব্দে। এবার এই ধাপটাতে যে যত সাবলীল ভাবে লিখতে পারে, তার লেখা ততটাই চিত্তাকর্ষক হবে। এতো কিছু ভাবলাম, কিন্তু ভাবা আর বাস্তবায়ন এক জিনিস নয়। প্রতিটা চেষ্টায় মাঝ রাস্তায় ইতি টানতে হল। তারপরেও কত কিছু ভাবলাম, এবার কোনো হাসির গল্প, মূল চরিত্রের নাম দিলাম হাঁদুদাদু। কিন্তু চরিত্রের নাম ভেবে নিলেই তো আর চরিত্রটা আঁকা হয় না, তার জন্য কাহিনী লাগে, প্লট লাগে। মনের ভিতরে কোনো কাহিনীই সাজাতে পারলাম না। তাই হলোনা লেখা। আরও কত কি নিয়ে ভাবলাম, সেনবাড়ির পম্পার করুন জীবনকাহিনী, আমাদের পাড়ার কুকুর ভুলুর আত্মকথা। কিন্তু সেই আর লিখে উঠতে পারলাম না, মাঝ রাস্তায় পেট্রোল শেষ। কেমন একটা আশাহত লাগল, আমিই আবার বাংলার উত্তর শুরু করতাম এই ভাবে—“রবিরশ্মীর ন্যায় দেদীপ্যমান শরৎ চন্দ্রমার তিমিরভেদী স্নিগ্ধ পুলকিত জ্যোৎস্নার দীপ্তি নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন এক চিরভাস্বর ধ্রুবতারা, কবিকুলপতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর”। ঢং যত সব। কিন্তু এটাই দুঃখ; শেষ অবধি আমার আর গল্প লেখা হয়ে উঠল না।

# নকুড়মামার সঙ্গে

গুরুদাস ঘোষ

ক্যালেন্ডারে কোনো ছুটির কথা ছিল না, ছিল না কোনো মিটিং, মিছিল কিংবা বন্ধ। তবু আমাদের কলেজ ছুটি হয়ে গেল। কয়েক মাস হল ফাস্ট ইয়ারের ক্লাস শুরু হয়েছে। সকাল সওয়া দশটায় অনার্সের একটা ক্লাস ছিল। তাড়াছড়ো করে কলেজে পৌঁছে শুনলাম আজ কোনো ক্লাস হবে না। একজন প্রাক্তন অধ্যাপক মারা গেছেন, সেইজন্য আজ কলেজ ছুটি।

ইস! আগে জানলে এত তাড়াতাড়ি স্নান-খাওয়া সেরে, ভীড় বাসে গুঁতোগুঁতি করে কে কলেজে আসতো! কিন্তু এখন সে কথা ভেবে আর লাভ কী!

ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন বন্ধু এসে পড়ল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার ইচ্ছা ছিল না। তাই আমরা কয়েকজন বন্ধু কলেজের কাছেই ‘মুখরুচি’ রেস্টুরেন্টের কোণের টেবিলে আরাম করে বসলাম। এই সময় ক্রেতার ভীড় তেমন থাকে না। চা, ডিম টোস্ট, কিংবা ঘুগনি পাঁউরুটি নিয়ে বসে থাকা চলে অনেকক্ষণ। ধ্রুব একটু আগেই সদ্য কেনা সিগারেটের প্যাকেট খুলে সবাইকে অফার করেছে। এমনিতে আমি সিগারেট খাই না, তবু শখ করে আজ একটা নিলাম। সনৎ সিনেমা দেখার প্রস্তাব করেছিল কিন্তু সর্বসম্মতিক্রমে সেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার আগেই কয়েকজন বন্ধু বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে বাড়ি চলে গেল। সহপাঠিনীরা কিছুক্ষণ আগেই দল বেঁধে মার্কেটিং করতে চলে গেছে। আমরা পাঁচজন বসে ভাবছিলাম কী করা যায়। শেষে ঠিক হল চিড়িয়াখানায় যাওয়া হবে। আলিপুর চিড়িয়াখানা সবারই দেখা, তবু চিড়িয়াখানার বিশাল পরিসরে ঘুরে ফিরে সময়টা কাটবে। চায়ের কাপ খালি হয়ে গেছে। মাথার উপরে সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। এমন সময় ঘাড়ের কাছে গরম নিঃশ্বাস অনুভব করে চমকে ফিরে দেখি — নকুড়মামা!

নকুড়মামা আমার নিজের মামা নন, তবে আত্মীয়তার সম্পর্কে মামা। বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। গালে কাঁচাপাকা

দাড়ি। মাথায় উষ্ণশুষ্ক চুল। ডোরাকাটা পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামার সাথে সম্পূর্ণ বেমানান উডল্যান্ডস-এর হাইঅ্যাক্সেল জুতো। কাঁধের শান্তিনিকেতনী ব্যাগটা এতই পুরনো যে প্রকৃত রঙ কি ছিল তা আন্দাজ করা অসম্ভব। নকুড়মামার এই বেশভূষা আমার কাছে নতুন নয়। এই রকম বিচিত্র পোষাকে নকুড়মামাকে আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি। কিন্তু কলেজের বন্ধুদের ধূমপানের আড্ডায় নকুড়মামার আকস্মিক আগমনে আমি মনে মনে প্রমাদ গুনলাম।

— “মামা তুমি এখানে!” নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই আত্নাদের মতো শোনালো।

— “কেন, এখানে আসতে কোনো বাধা আছে নাকি?” একথা বলে নকুড়মামা আমার পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বিচ্ছিন্নভাবে খ্যা-খ্যা করে হাসতে লাগলেন।

— “ছেলেমানুষদের সিগারেট খেতে নেই, ওটা আমায় দে” — বলে আমার হাত থেকে সিগারেটটা কেড়ে নিয়ে তর্জনী আর মধ্যমার ফাঁকে গুঁজে মুঠো করে গাঁজা খাওয়ার ভঙ্গিতে টানতে লাগলেন নকুড়মামা।

কয়েক মাস যাবৎ কলেজে যাওয়া শুরু করেছি। সপ্তাহে দু-দিন গালে শেভিং ক্রিম মাখিয়ে নিখুঁতভাবে দাড়িও কামাচ্ছি। শুধু তাই-ই নয়, ইদানিং বাসে কন্ডাক্টর ভাড়া চাইতে গেলে ‘তুমি’র পরিবর্তে ‘আপনি’ সম্বোধন করে। বন্ধুদের আড্ডায় দু-একবার সিগারেট যে টানিনি তা নয়। কিন্তু কথায় আছে না, যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়। এভাবে নকুড়মামার হাতে ধরা পড়বো, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। এর পরে নকুড়মামা আমাদের বাড়িতে গেলে হয়তো বলে বসবেন — ওকে সেদিন দেখলাম কলেজের ক্লাস ফাঁকি দিয়ে রেস্টুরেন্টে বসে কতগুলো বখাটে ছেলের সঙ্গে সিগারেট ফুকছে। সেই সংবাদে বাড়িতে যে কী পরিমাণ সম্মান-সৌভাগ্য জুটবে তা কল্পনা করে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম।



নিজে থেকেই বললাম, “আজ আমাদের কলেজ ছুটি হয়ে গেছে তো, তাই এখানে একটু গল্প করছি।”

— তা এরা তোমার ফ্রেন্ড? বাঃ বাঃ বেশ!

বন্ধুরা চুপ। অনেকগুলো দৃষ্টি নকুড়মামাকে পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। নকুড়মামা যেন নিজের ভাব-জগতে চলে গেছেন। চোখ বুজে গাঁজা খাওয়ার ভঙ্গিতে সিগারেট টেনে চলেছেন। ওঠার কোনো লক্ষণ নেই। আমি মামার মনোভাব বুঝতে জিজ্ঞাসা করলাম, মামা, তুমি এখন কোনদিকে যাবে?

“যাওয়ার তো অনেক জায়গা ছিল, কিন্তু তাদের সঙ্গে যখন দেখা হয়ে গেল, তখন আজ অন্য কোথাও যাবো না। তাদের সঙ্গে গল্প করেই দুপুরটা কাটিয়ে দেবো।” চোখ না খুলেই নকুড়মামা বললেন।

শুনে আমি যারপরনাই ঘাবড়ে গেলাম। বন্ধুরা না জানলেও আমি জানি নকুড়মামার মানসিক সমস্যা আছে। একদা মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কিন্তু পড়তে পড়তেই বোধহয়, মাথার কিছু নাটবল্টু ঢিলে হয়ে গেছে। নকুড়মামা সর্বদাই কোনো জটিল তত্ত্ব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে চলেছেন। ভাগ্যক্রমে কোনো মনোযোগী শ্রোতা পেয়ে গেলে নকুড়মামাকে থামায় কার সাধ্য! তাই মামার কথায় আমি রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। এখন বন্ধুদের যদি বিজ্ঞানের কোনো জটিল তত্ত্ব বোঝাতে বসেন, তাহলে কেলেঙ্কারি!

ভয়ে ভয়ে বললাম, আমার বিকেলে কোচিং আছে। আমি বরং বাড়ি চলে যাই।

নকুড়মামা খপ করে আমার হাতটা চেপে ধরে বললেন, “মতলবটা কী বলতো শুনি! কলেজে তো এসেছিলি, তখন পড়ার কথা মনে ছিল না?”

নকুড়মামার গণ্ডারের গোঁ। একবার যা মনস্থির করবে, তা করবেই। এই মুহূর্তে নকুড়মামাকে ঝেড়ে ফেলা যাবে না। চোখের ইশারায় বন্ধুদের জানালাম, তোরা চলে যা, আমার আর যাওয়া হবে না।

ভাস্কর বলল, আমার একটা জরুরি কাজ ছিল, আমি আসছি রে। প্রব তার এক অসুস্থ পিসিকে দেখতে যাবে বলে চলে গেল। প্রদীপ আর নীলাঞ্জনও এক একটা অজুহাত দেখিয়ে চলে গেল। একা আমি পড়ে রইলাম নকুড়মামার খপ্পরে।

নকুড়মামা সিগারেট শেষ করে আমাকে নিয়ে পড়লেন।

— কি, বন্ধুরা তোকে ফেলে চলে গেল?

আমি আর কি বলবো! অদৃষ্টকে দোষারোপ করা ছাড়া আর কী বা করার আছে!

নকুড়মামা বললেন, তা কোথায় যাওয়ার প্ল্যান হচ্ছিল শুনি?

বললাম, চিড়িয়াখানা যাওয়ার একটা কথা উঠেছিল।

নকুড়মামা পাঞ্জাবির পকেট এবং ব্যাগ খুঁজে কতগুলো পুরনো ফাউন্টেন পেন বার করে টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, “ভাবছি কলেজস্ট্রীটে যাবো। এই পেনগুলো সারাতে হবে।”

বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ালাম মামার সঙ্গে। কলেজস্ট্রীটগামী একটা ফাঁকা বাস দেখে আমি উঠতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু মামা আমার হাত টেনে ধরলেন। বললেন, করছিস কি!

— কেন ফাঁকা বাস তো। এর থেকে ফাঁকা আর পাবে না।

— বাসে যাবো, এ কথা কে বলল তোকে? সময় যখন হাতে আছে, হেঁটেই যাবো।

কপাল দোষে আজ পড়েছি নকুড়মামার হাতে, জানি না কত দুর্গতি রয়েছে কপালে! ভর-দুপুরে এতটা পথ হাঁটতে কারই বা ইচ্ছে করে! কিন্তু কাকে বোঝাবো? মামা আপন খেয়ালে হেঁটে চলেছেন।

বিধান সরণীর ফুটপাথ ধরে হেঁটে চলেছি। পথের পাশে একটা লোক নিম্ন গাছের ডাল বিক্রি করছিল। নকুড়মামা তার কাছ থেকে দুটো ডাল কিনে নিয়ে একটা বেঞ্চে বসে পড়লেন। শান্তিনিকেতনী ব্যাগ থেকে একটা পেন্সিলকাটা ছুরি বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, “নে ছোটো ছোটো করে কাট। দাঁতন হবে। টুথব্রাশ আর পেস্টের থেকে অনেক ভালো।”

দাঁতন মাপমতো কাটা হলে সেগুলো জোর করে আমার ব্যাগে পুরে দিয়ে মামা বললেন, “এবার থেকে রোজ সকালে নিম্নের দাঁতন ব্যবহার করবি।”

জন্মাবধি আমি টুথপেস্ট ও ব্রাশ ব্যবহার করি। তাতে আমার দাঁত এখনো পর্যন্ত ভালোই রয়েছে। এখনও শব্দ মটরভাজা থেকে শুরু করে আখ কিংবা পাঁঠার ঠ্যাং

অনায়াসে খেতে পারি। তবুও আমায় কি না এই বিষ-তেতো নিমের ডাল চিবিয়ে মরতে হবে! তবে প্রতিবাদ করে লাভ নেই, কথায় কথা বাড়বে। নিয়ে তো রাখি। রোজ সকালে নকুড়মামা নিশ্চয়ই দেখতে আসবেন না।

কেন জানিনা নকুড়মামার চলার গতি কমে গেছে। রাস্তার দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে হাঁটছেন। ফুটপাথের হাল খুবই খারাপ। পাশে কতগুলো লোহা-লকড়ের দোকান। রাস্তার পাশের কলে কেউ কেউ স্নান করছে। এর মধ্যেই নকুড়মামা একটা বেয়ারিং, একটা ভাঙা পেনের খাপ কুড়িয়ে ব্যাগে পুরে নিলেন।

আমি আগেও দেখেছি, অনেক পাগলেরই অপয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করার প্রবণতা থাকে। অনেক পাগলকে আমি ছেঁড়া জুতো, কোট, চট, প্লাস্টিক, জলের বোতল, ভাঁড় — এ সব সংগ্রহ করতে দেখেছি। নকুড়মামা কি তাহলে পুরোপুরি পাগল হতে চলেছেন? হায় ভগবান! আমি চারপাশে একবার তাকিয়ে দেখে নিলাম কেউ আমাদের লক্ষ্য করছেন না তো!

কলেজস্ট্রীটের বইপাড়ায় না ঢুকে নকুড়মামা মহাত্মা গান্ধী রোডের ফুটপাথ ধরে এগিয়ে চললেন। খুঁজতে খুঁজতে একটা পেনের দোকানে গিয়ে পেনগুলো দেখাতেই দোকানদার তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিল, পেনগুলো সারানোর অযোগ্য। কিন্তু ওই যে বলেছি, নকুড়মামার গণ্ডরের গোঁ। একবার যা মাথায় ঢুকবে, তা বার করে কার সাধ্য!

এ গলি, ও গলি ঘুরে পেনের দোকান খুঁজে চলেছি। মামার আদেশ - কোনো পেনের দোকান দেখলেই বলবি। ছোটো-বড়ো প্রায় এক ডজন দোকানে দেখানোর পর একটি দোকান মামার পেনগুলো খুঁটিয়ে দেখে জানাল, একটি পেন সারানো যেতে পারে। অন্যগুলোর অবস্থা এতই করুণ যে সারানোর থেকে নতুন কেনা লাভজনক।

আমরা দোকানেই দাঁড়িয়ে আছি। দোকানদার পেন সারাতে সারাতে বলে চলেছেন, আজকাল তো লোকে কালির পেন ব্যবহারই করে না। এ পেন আগে অনেক বিক্রি করেছি। আমরা ছোটোবেলায় ব্যবহার করেছি। তা কোথায় পেলেন?

— পড়ে ছিল আর কি। মামা দায়সারা জবাব দেন।

যাক বাবা! পথে পড়েছিল — এ কথা যে বলেননি তাই

রক্ষে। আমি নিশ্চিত যে সব পেনগুলো পথেই কুড়িয়ে পাওয়া। সেই পুরনো পেন সারাতে খরচ হল একশো ত্রিশ টাকা। যা দিয়ে অনেকগুলো নতুন পেন কেনা যেত।

এরপর নকুড়মামা কোনো অখ্যাত লেখকের লেখা বই ‘বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাস’ খুঁজে চললেন। এ সব বই এখন আউট অফ প্রিন্ট। তাই অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না। শেষে একটা ইংলিশ টু বেঙ্গলি ডিকশনারি কিনে আমার হাতে দিয়ে বললেন, এটা হাতের কাছে রাখবি। কাজে আসবে। বাড়িতে কি অভিধানের অভাব আছে না কি! তবু প্রতিবাদ করলাম না। নকুড়মামা যখন দেবে মনে করেছে তখন প্রত্যাখ্যান করা নির্বুদ্ধিতার নামান্তর।

জল তেষ্টা পেয়েছে। পথের দুধারে ঠাণ্ডা পানিয়ার দোকানও রয়েছে প্রচুর। কিন্তু নকুড়মামাকে সে অভিলাষ ব্যক্ত করতে ভয় হল। তাহলে হয়তো ঠাণ্ডা পানিয়ার গুণাগুণ ব্যাখ্যা করতে বসবেন। সব মিলিয়ে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। এবার নকুড়মামার হাত থেকে ছাড়া পেলে হয়!

হাঁটতে হাঁটতে মামা সাঁৎ করে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। রাস্তার ওপর থেকেই একটা কাঠের সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। নকুড়মামা সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলেন। শক্তিত মনে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে উঠতেই আমার শঙ্কা দূর হলো। একটা হোটেল। জায়গা খুব বেশি না হলেও ব্যবস্থা ভালোই মনে হলো। হোটেলের লোকজন যে মামাকে চেনে তা বোঝা গেল। মামা পাঞ্জাবির আস্তিন গুটিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আমিও মামাকে অনুসরণ করলাম। তারপর যা হল --- একেবারে রাজসিক খাওয়া! মটন কবিরাজি, ক্ষীরের চমচম, হিমশীতল কুলফি। আঃ প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল! এই গলির মধ্যে এমন একটা হোটেল আছে তা আমার ধারণায় ছিল না। নকুড়মামা খেতে খেতে বললেন, আর কিছু খাবি?

আমি মাথা নাড়লাম। সত্যি! কে বলবে একটু আগে এই লোকটাই পথের ধুলো থেকে পেনের ঢাকনা কুড়িয়েছে!

নকুড়মামা কোনোদিন চাকরি করেছেন বলে শুনি নি। তবে টাকা পয়সার চিন্তা করতে হয় না। শুনেছি নকুড়মামার পৈতৃক সম্পত্তির পরিমাণ কম নয়। শুধু বাড়ি ভাড়ার টাকাই অনেক। তাই হয়তো প্রয়োজনও নেই।

হোটেল থেকে বেরিয়ে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির

পাশের ফুটপাথে ছড়িয়ে রাখা ভাঙা চশমা, ফোনের চার্জার প্রভৃতি ফালতু জিনিসের মধ্যে থেকে কি যেন খুঁজতে শুরু করলেন। আমি পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। নকুড়মামার অনুসন্ধানে ব্যাঘাত ঘটানোর ফল মারাত্মক হতে পারে।

ঠং.. ঠং শব্দে একটা ট্রাম ধীর গতিতে আসছিল। হঠাৎ কী মনে করে নকুড়মামা অনুসন্ধান অসমাপ্ত রেখেই ট্রামের দিকে দৌড়োতে থাকলেন। পিছনে পিছনে আমি। ওখানে স্টপেজ নেই। ট্রাম আমাদের পেরিয়ে এগিয়ে চলল। তবে কিছুদূরে এগিয়েই ট্রামটা জ্যামে আটকালো। আমরাও উঠে বসলাম।

কন্ডাক্টর টিকিট কাটতে এলে মামা একটা পঞ্চাশ টাকার নোট এগিয়ে বললেন, “দুটো শেষ।”

নিচু স্বরে বললাম, মামা এই ট্রামটা কোথায় যাবে?

— তা দিয়ে তোর কি দরকার? যাওয়া নিয়ে কথা।

ঘড়িতে দুপুর দুটো পঞ্চাশ। এখন আমরা চলেছি নিরুদ্দেশের পথে। আজ বাড়ি ফেরা হবে কি না সে বিষয়েও সংশয় আছে। একটাই ভরসা। সবকিছুর দায় নকুড়মামার। আমি কি ছাই নিজের ইচ্ছায় শহর পরিক্রমা করতে বেড়িয়েছি?

ট্রামটা ছিল বি বি ডি বাগের। শেষ স্টপে ড্রাইভার, কন্ডাক্টরের সঙ্গে আমরাও নামলাম।

— “চিড়িয়াখানা দেখা হল না, তাই না?” নকুড়মামা সান্ত্বনার সুরে বললেন।

কথাটা ঠিক। আর সেটা নকুড়মামারই জন্য। তবু এ প্রশ্নের আর কী উত্তর হয়! মুখে বললাম, সে তো অনেকবার দেখেছি।

— চিড়িয়াখানায় আর আছে কী! ওই তো খাঁচায় বন্দি মৃতপ্রায় কতগুলো প্রাণী। চল আজ তোকে মুক্ত চিড়িয়াখানা দেখাবো।

এই বলে মামা পার্কের একদিকে আমাকে নিয়ে গেলেন। একটা ছোলাবাদামওয়ালার কাছ থেকে কিছুটা ছোলাভাজা কিনলেন। একটু আগেই এত কিছু খাবার পর কারো যে ছোলাভাজা খাবার ইচ্ছা জাগতে পারে, তা মামাকে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না।

— পার্কটার নাম জানিস

— না

— কার্জন পার্ক।

পার্কের লোহার রেলিং-এর কাছে গিয়ে মামা বললেন, “এবার দেখ।” প্রথমে কিছু বুঝতে না পারলেও একটু পরেই দেখতে পেলাম মাটির মধ্যে অসংখ্য গর্ত। তার থেকে বেরিয়ে আসছে অসংখ্য ইঁদুর। বেরিয়ে আসছে, আবার গর্তে ঢুকছে। মামা ছোলার ঠোঙটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, “ওদের দিয়ে দে।”

একমুঠো ছোলা ছুঁড়ে দিতেই কয়েকশো ইঁদুর বেরিয়ে এল। নানা আকারের ইঁদুর। ইঁদুরদের কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে অনেকক্ষণ কেটে গেল। ছোলা খাওয়ানো শেষ হলে দুজনে গাছের নিচে একটা বেধে বসলাম। মামা একটা সিগারেট ধরালেন। কর্মব্যস্ত কোলাহলমুখর শহরের মধ্যে এই শান্ত নিরিবিলা পার্কটা যেন এক মরুদ্যান। শহরের ইঁদুর-দৌড়ের প্রভাব এখানে পড়েনি। এমনকি এখানকার ইঁদুরদের মধ্যেও নয়। পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। বিপরীত দিকের একটি বেধে এক মধ্যবয়সী লোক শুয়ে ঘুমোচ্ছে। গাছ থেকে একটা কাঠবেড়ালি লাফাতে লাফাতে পায়ের একেবারে কাছে চলে এল। কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে আবার গাছে উঠে গেল। ঘড়িতে দেখলাম সময় চারটে দশ। আর দেরি করলে সম্ভ্যার কোচিং ক্লাস মিস হয়ে যাবে। মামাকে বলতে যাচ্ছিলাম সে কথা। কিন্তু তার আগেই মামা সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে বললেন, এবার তোর ফেরা দরকার, না হলে বাসে ভীড় হয়ে যাবে।

একটু এগিয়ে মিনিবাস স্ট্যান্ড। নকুড়মামা আমাকে একটা মিনিবাসে তুলে দিয়ে বললেন, তুই একাই চলে যা। আমি এখন ভবানীপুর যাবো। দিদিকে বলিস, আগামী সপ্তাহে রাতের দিকে একবার যাবো। তারপরে হেসে স্বরটা নিচু করে বললেন, “যদিও আমি তোকে স্বচক্ষে সিগারেট খেতে দেখিনি। তবু বলি জিনিসটা ভালো নয়।”

ড্রাইভার বাস স্টার্ট দিতেই নকুড়মামা বাস থেকে নেমে পড়লেন। আমার দিকে একবার হাত নেড়ে মিশে গেলেন জনসমুদ্রে। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎই ভীষণ ভালো লেগে গেলো নকুড়মামাকে। নকুড়মামার মাথায় ছিট আছে — একথা আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। কক্ষনো না।



# INTROSPECTION किस्सा DELIRIUM

সুতনু মুখোপাধ্যায়

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই বোধহয় একটা সমান্তরাল বিশ্ব থাকে, যেখানে আমাদের রোজকার সব দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা আর মনখারাপগুলো ‘নেই’ হয়ে যায়। হার্টবিটের সিম্ফনি যখন ঘড়ির টিক-টিক-এ অনূদিত হয়, শহরতলির রাস্তায় জেগে থাকে পাড়ার নেড়ি আর স্ট্রিট লাইট চুইয়ে পড়া আলোয় ভিজে যাওয়া ফুটপাথ; তখনই আমাদের আর সব অপ্রাপ্তির মতোই সহজলভ্য সেই অন্ধকারের ভিতর, নিজের অজান্তেই ঘটে যায় মেটামরফোসিস!

সারাদিনের অ্যালার্ম ঘড়ি, লোকাল ট্রেন, বন্ধুত্ব, প্রেম, আড্ডা, অ্যাসাইনমেন্ট, অ্যাপ্রেন্সাল, পুড়ে যাওয়া ফিল্টার আর চায়ের ভাঁড়ের টুকরোগুলো নিয়ে তখন জিগ-শ পাজল খেলার সময়। সাফল্যের সম্ভাবনায় স্বপ্নিচাপড়ানি আর ব্যর্থতার ক্ষতে অ্যান্টিসেন্টিমেন্ট লাগানোর সময়। নিস্কোফিলীয় নিয়নের স্রোত জাগায় অ্যামিগডালায় স্পন্দন। পরীক্ষায় সাপ্লি কিম্বা শূন্য রানে আউট হওয়াকে কাউন্টার করে খুচরো স্বপ্নের সিলেবল।

কখনো কখনো এমনই কোনো সলিচিউড সিড্রোমে আত্মগোস্ত্র রাতে খুলে যায় সেই লাজারুস পিট... পাল্টে যায় দৃশ্যপট, আবছা হয়ে আসে অক্ষর, বুকশেল্ফ, ফুটবল মাঠ... জানালার ওপাশের বুপসি অশ্বখ হয়ে ওঠে মধ্য আফ্রিকার বাওবাব, ২২১ বি বেকার স্ট্রিট এসে মিশে যায় ২১ রজনী সেন রোডে, শঙ্করের সাথে টম সয়ার যায় যথের ধনের সন্ধানে। একে একে পেরিয়ে যায় নিশ্চিন্দিপুর, মালগুডি, এল ডোরাডো, ট্রেজার আইল্যান্ড, আটলান্টিস...!

হঠাৎ নোটিফিকেশনের শব্দে ছিঁড়ে যায় নৈশ্বেদের নকশী কাঁথা, ফ্ল্যাশব্যাকে পাওয়া এক টুকরো অল্টারনেট রিয়্যালিটি। আর এভাবেই প্রতিরাতে একটু একটু করে বড়ো হয়ে যাই আমরা!

.....

আমাদের সবারই একটা নিজস্ব ক্যালাইডোস্কোপ থাকে, একটা দক্ষিণের জানলা থাকে, যেখানে আমাদের সব অসমাপ্ত গল্পগুলো রূপকথা হয়ে যায়! যেখানে দিন-রাতের মাঝে একটুকরো নো-ম্যানস ল্যান্ড হয়ে বিকেল নেমে আসে, তারপর একসময় ছায়ার স্তূপ জমে সন্ধে। গরাদের ওপারে বেড়ে চলে স্ট্রিট লাইটের কিউ, ব্যাকস্পেসে মুছে যায় আকাশের ফিরোজা রঙ। পাখিরা উড়তে উড়তে আকাশে মিলিয়ে যায়, অটোর লাইনে ভীড় বাড়ে— সবাইকেই ফিরতে হবে; আমাদেরও কোথায় যেন ফেরার কথা ছিল না?

যেসব বিকেল-সন্ধে, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ, আদর-উপেক্ষা, বন্ধুত্ব আর বিচ্ছেদগুলো মরশুমি ফুলের মতোই ঝরে গেল, যেসব দিন-রাতকে নিয়ে কেউ কখনো কবিতা লিখলো না, যে পুরোনো গিটারটা সিঁড়ির ঘরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিল, যে বইগুলো হারিয়ে গেল ধুলোর স্রোতে, যেসব অ্যাডভেঞ্চারে এবার আর যাওয়া হল না, যে কিশোরীর সাথে দিগন্তে পাড়ি দেওয়া অধরাই থেকে গেল— তারা সবাই আসলে মিশে আছে ঐ ক্যালাইডোস্কোপের নকশায়, ফিরে আসার অপেক্ষায়...





# তার প্রতি

## অনন্যা চক্রবর্তী

আজকে আকাশের চাঁদটাও লান তার হাসির জ্যোৎস্নার কাছে,  
 কোটি কোটি তারারা হিংসা করে কারণ আমার নিজের একটা সূর্য আছে!  
 তার আলোয় ওরম কতো শত চাঁদ, তারা, মহাকাশ আলোয় মেখে থাকে,  
 সে সবার প্রাণ জুড়িয়ে ভালোবাসার জোয়ারে বাঁধ ভেঙে ডাকে,  
 যেখানে অন্ধকার নেই, দুমুঠো রোদের মতো তার রেশ,  
 সে আমার একলা পথ চলার গান, এক চিরন্তন ভালোবাসার অভ্যাস;  
 ফুলের মিষ্টি গন্ধের মত সে আছে আমার সারা দালান ঘর জুড়ে,  
 হাতের কাছেই নাগাল যেন, সে যতোই হোক মাইল ফলক মাপের দূরে!  
 ফুলের রঙ-বেরঙের বাহার তার ওই গালে টোল পড়ার ভাঁজে ভাঁজে,  
 একটু খানি অবসর যেনো ক্লান্ত মনের পাহাড় প্রমাণ কাজে,  
 মৃদু বাতাসের সাথে মিশে স্পর্শ করে সে আমাকে রোজ,  
 হারিয়ে যেতে চাই আমি তার সাথে, মানচিত্র ছেড়ে আজ নিখোঁজ,  
 তাকে পেয়ে যেন সব পেয়েছি, সব খুশি যেন আমার কোলে,  
 এইভাবেই হয় তো মানুষ সিদ্ধি লাভ করে, মন ভালো করার মানুষ পেলে,  
 বৃষ্টির মতো মন ছুঁয়ে যায় সে, ভিজে যায় তপ্ত হৃদয় শক্ত মাটি!  
 আমিও এক সাধারণ মানুষ যার মন তার উপনিবেশের ঘাঁটি,  
 মনে হয় প্রাণ খুলে বৃষ্টির তালে তার সাথে ভিজি ছাতিম গাছের তলে,  
 বুঝেছি তার সঙ্গ পেয়ে নিখাদ ভালোবাসা কাকে বলে!  
 শরতের পেঁজা তুলোর মতো আমার মনের আকাশ জুড়ে তার প্লাবন!  
 ঋতুর বৈপরীত্য তার উপস্থিতিতে যেমন শীতেও নামে অকাল শ্রাবণ!  
 দুঃখ কেটে যায় তার আগমনে এই দুঃখী পৃথিবীটা কত যেন সুখী,  
 আমার অপলক তাকানো তার দিকে, যেমন সূর্যের পানে চেয়ে সূর্যমুখী,  
 আমার গোটা বসন্ত তার মনের গোলাপী রঙে দোলের প্রারম্ভ করে,  
 ওই ছুটি ছুটি ডাকটা সময় কালের উর্ধ্বে উঠে রোজ আমাকে জাপটে চেপে ধরে,  
 জীবনে সেই মানুষটাকে পেয়েছি আমি জন্ম থেকেই খোদার আশিস রূপে,  
 সে যেন সেই চণ্ডীমণ্ডপে মিষ্টি বাতাস যা মোহিত থাকে সুগন্ধি ধূপে!  
 এই ভাবেই প্রতি কবিতায় মনের কথা অল্প অল্প করে জানাই তাকে তাই!  
 প্রতি জন্মেই, যেন দিদি তাকে জীবনের ধ্রুবতারা রূপে আমি পাই!

# ফুল ধরা মেয়ে

অনন্যা চক্রবর্তী

ও মেয়ে তুই চুপ কর! ও মেয়ে তুই আরো পাঁচটাকে চুপ করতে বল,  
এ সমাজ দেখেনি তাদের লড়াই গুলো, দেখেছে শুধু চোখের জল;  
তাই ও মেয়ে তুই চুপ কর! সমাজ বলে সে মেয়েই ভাল যার মুখে হাসি,  
অভিনয় করতে করতে তাই কঙ্কাল গুলো দাঁত বের করে রাশি রাশি;  
কতো শত বসন্ত কেটেছে, তবুও বসন্তের ছঁকা গুলো মেলায়নি,  
মুখ ঝামটা, মেয়ে মানুষের খোঁটা, করুণা গুলো স্বপ্ন দেখে তাদের ভোলায়নি;  
মেয়েরা নাকি মেয়েদের বরাবর শত্রু, জানে না বেঁধে রাখতে,  
এসব তোমরা বলো তাদের, যারা বাপের ভিটে ছেড়ে বরের বাড়ি আসে ভাড়া থাকতে;  
সে বাড়ি, সে স্বামী, সে জমি, সে ঘর সবেতেই কেমন যেন পর পর গন্ধ,  
সে চার দেওয়ালের রান্ধস আর দু কামরা ঘরে, আপন বলতে ঘুলঘুলির ওই রন্ধ;  
তাদের জীবনটা ওইটুকুই, যতো টুকু ওই ছোটো খোপ খোপ জগৎ তারা দেখে,  
বিনা বেতনের কর্মচারী! তাদের বকশিশ দেওয়ার কথা কে মাথায় রাখে;  
সে মেয়েটাই আজ লড়ছে খুব, ২রা পৌষ প্রসবের আনন্দ আসে মৃত্যু যন্ত্রণা নিয়ে,  
সারারাতের লড়াই শেষ, ফুটফুটে কন্যাকে অজানা এক অদৃষ্টের হাতে তুলে দিয়ে,  
শাশুড়ি নাম দিলো লতা, যার আগমনে হানা দিয়েছে অশুভ শক্তি!  
নিভে যাক এমন বংশ প্রদীপ যার অগ্রদূত মেয়ে মানুষ এক রত্তি!  
সেই ছোটো মেয়েটার হলো দোষ সে নাকি ডাইনি, খেয়েছে তার মাকে,  
কেউ কোনো দিনও কোলে করে আদর করেনি, সোনা বলেই বা কে ডাকে।  
দু বেলা পেটে জায়গা থাকে, তবে মনের ভালবাসার পাতটা একেবারেই ভরেনা;  
আস্তাকুরে ঠিক যেমন থাকে আবর্জনা, তার কথা কারো মনে পরে না;  
এখন তার বয়স ১৩, তার উঠতি বুকের পাটায় ছেলেরা দিয়েছে পাহাড়া মাছির মতো,  
চোখের চাহনিতে শুষে নিয়েছে তার জীবনস্বত্ব তখনও বাকি ছিলো যতো,  
বিয়ের কথা হচ্ছে তার, ঠাকুমা আর জাত যায় ঋতুচক্র পাড় মেয়ে ঘরে রেখে,  
ঘোটকদের হাতে রঙিন ছবি, তার বিয়ের লগন ঘনিয়ে এলো মহাকাল ডেকে!  
বর তাকে কি খুব ভালোবাসে? রোজ রাতে তার শরীরটাকে সে গিলে খায়!  
ভীষণ যন্ত্রণা মেশানো কান্নার রোল গোপনে উঠে রোজ ভোরে মিলিয়ে যায়,  
পুরুষ মানুষের ভালোবাসা নাকি এরমই হয়, শাশুড়ি বলেছে সব ঠিক আছে!

বরও যে ধর্যক হতে পারে সে কথা সমাজে প্রচার না হয় পাছে!!  
 শাশুড়ি বলেছে মেয়ে মানুষের বড়ো আত্ম তুতু তিলকে করে তাল  
 মেয়ে হওয়া আর এমন কি অন্যের ঘরে বসে ভাঙো চাল,  
 একসময় সে হাঁপিয়ে উঠে ছুটে যেতে চেয়েছিলো তার অবহেলায় ভরা বাপের ভিটে!  
 এরূপ ভালোবাসার ছাদ ভেঙে পরুক, মাথা গুঁজে তবুও বাঁচা যায় অবহেলার হাঁটে!  
 বাড়িতে খবর দিলেও আসেনি কেউ তার বোঝা টেনে বওয়ার ভার নিতে,  
 মাটিতে চোখের জলে কাটা আঁকি বুকি গুলো পারেনি তার মাকে ফিরিয়ে দিতে!  
 বছর হলোনা ১৮ পার পেটে এলো তার প্রথম সন্তান!  
 সে চেয়েছিলো মায়ের মত উপসংহার, মরেই যেন হয় সমাধান,  
 মেয়েদের মানিয়ে নিতে হয়, নইলে সংসার টিকবে কি করে!  
 মেয়েরাই জানে নিজেকে নিঃশেষ করে কিভাবে সত্যি করে মিথ্যার ইমারত গড়ে!  
 ছেলের মুখের দিকে চেয়ে সব কষ্ট দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করার নামই হল মা;  
 তাই সব ভালোবাসা গুলো চাইলেও একটা প্রাণের জন্ম দিতে পারে না!  
 বুকের রক্ত মুখে তুলে একাই ছেলেকে বড় করেছিলো নিজের দমে,  
 ২০ বছর দেখা নেই সেই সরকারি চাকুরে ছেলের, এদিকে দরজায় কড়া নেড়েছে যমে!  
 অবশেষে যাওয়ার বেলায় তার মুখে কেমন এক সব পেয়েছির মত হাসি,  
 এইবার সে মুক্ত তার স্বপ্ন পূরণে খুশির তুষার পরুক রাশি রাশি!!  
 মৃত্যু কি কেবল দুঃখ আনে কখনও মুক্তির পথ দেয় খুলে!  
 এতোটা কষ্ট যদি না থাকে তোর মৃত্যুর কোলে যাসনা ভুলে;  
 না তুই কষ্টে নেই, মন খারাপ যদি হয় ক্ষমা চেয়ে নিস তুই লতার মতো মেয়েদের কাছে,  
 তুই যাকে শেষ ভাবিস, প্রতিদিন সেটা শুরু করে এরম কতো মেয়ে বেঁচে আছে!  
 ও মেয়ে তুই চুপ কর, কাঁদিস না পরে অনেকটা জীবন আছে পড়ে;  
 একবার নিজেকে সামলে ধর বল ছুঁয়ে যাবো মহাকাশ ধরবো আলো দুহাত ভোরে,  
 তুই যদি নিজে উড়তে না শিখিস অন্যকে কি করে টেনে তুলবি!  
 ওলো মেয়েছেলে! তুই একদিন তোর সাফল্যের নতুন ইতিহাস গড়বি!  
 পিঠটান করে বাঁচ, একবিংশো শতকে তোরাই সকল ক্ষমতা বল!  
 এ সমাজ দেখবে তোদের উড়ান গুলো, মুক্তোর মতো দামী তোর চোখের জল,  
 নিজেকে আশা দে পারবি তুই! তোর গতিপথ অন্য মেয়ের স্বপ্ন দেখার সম্বল!  
 হ্যাঁ! তুই কাঁদতে পারিস খুশির জলে, গর্ব হয় যেন নিজের কর্ম কাজে,  
 পুরুষ তান্ত্রিক সমাজের মুখ যেন বন্ধ হয়, মাথা হেঁট হোক ওদের লাজে!  
 ও মেয়ে তুই চুপ কর! ও মেয়ে তুই আরো পাঁচটাকে চুপ করতে বল,  
 ও মেয়ে তুই চুপ কর! ওঠরে জেগে! আর পিছনে ফিরে দেখিস নারে।  
 চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দে পুরুষালী সমাজ টাকে, মেয়ে মানুষরা কি কি করতে পারে!!



## A CONFESSION

Gaurab Samanta

I have seen the worst  
Which truly made up my mind  
Maybe I got the answers only the questions  
had to find  
It is hard to quit, which makes me believe  
Just a part of me is alive

I took part in the festival of death  
You have to lose your senses to earn their faith  
They chose the crown over the crowd  
They are creatures of nothing but lust  
And we must celebrate the nemesis, not the  
past,

I was confused in my mind  
A girl gave me hope and the strength to live,  
She finds a way to break the chain  
Unfortunately, she gets trapped in the  
labyrinth of pain.

I lived in the dark  
Getting trapped in a society of fake honour  
An animal; I became an animal  
under false humanity and  
ready to accept their insanity of honour killing  
and I was shouting in my mind, "Please do not  
listen to those bastards"

But

I killed her  
I painted a naked globe with her sacred blood  
I adorn her with ugly roses  
I abscond with her promises,  
Did I confess ?

## SOMETHING

Abha Mahato

Something, there is something  
wonder about it ?  
Nothing to find, nothing to find  
Cause you can never cheat  
Go away, run away as soon as you can  
Nothing is able to diminish your pain  
Wake up...ooh...there is no much breeze  
Go ahead, otherwise something can make  
you freeze  
just stop...it is too much  
perhaps you will be deprived of someone's  
touch...



Suranjana Chakrabarty



মা

অর্ধেন্দু পাল

ছোট থেকেই তোমার ছোঁয়া,  
তোমার গন্ধ মাখা।  
তোমার কোলেই ঘুমিয়ে থাকা,  
তোমার কোলেই হাসা।

তোমার হাত ধরেই হাঁটতে শেখা  
বলে ফেলা প্রথম কথা —  
প্রথম ডাক ‘মা’।

আস্তু আস্তু চিনতে শেখালে অক্ষর আর সংখ্যা,  
শুরু হয়ে গেল পড়াশোনা, স্কুল যাওয়ার পালা।

তোমার হাত ধরেই এক একটা ধাপ পেরিয়ে চলেছি

ধীরে ধীরে।

অনেক ওঠানামা ছিল সেই পথে,  
সবকিছুই তুমি সামলে নিয়ে  
মসৃণ করে দিয়েছো আমার চলার পথ।

তোমার সাথে বললে কথা মন হয়ে যায় হালকা।  
তোমার ওপর করতে পারি যখন তখন রাগ,  
মান অভিমানের পালা কেবল তোমার সাথেই হয়,  
অন্তহীন ভালোবাসার প্রতীক হয়েই রও।

তোমাকে সব কথা নির্দিধায় যায় বলা—  
বকাবকি করতে পারো, কিন্তু বুঝিয়ে দাও,  
কোনটা করা ঠিক, আর কোনটা ভুল।  
তাই মা থেকে বন্ধু হয়েছো এখন,  
এই বন্ধুত্বের নাম কি জানিনা—  
এই বন্ধুত্ব বজায় থাকুক এইভাবেই চিরটা কাল।

দায়ী কে!!

সুরঞ্জনা চক্রবর্তী

ওই যে দেখা যায় দূরসীমানা,  
ঢেকে গেছে ধোঁয়ায়।  
কুহেলিকার ন্যায় তার করাল গ্রাস,  
পৃথিবী আজ আবদ্ধ তারই মায়ায়।।

সবুজ এই ধরিত্রীর বুক থেকে বিদায় নিচ্ছে শীতলতা,  
তার ছায়াময় বাহুডোর আজ উষ্ণতার চাদরে মোড়া।  
জানো? এর কারণ কারা - মানবজাতি!  
দীর্ঘদিন ধরিত্রীর বুক এ আশ্রয় নিয়েছে যারা।।

তারা ভুলে গেছে পৃথিবীর দান,  
দেয়নি তাকে জন্মদাত্রীর ন্যায় মান।  
সবুজ অরণ্যকে নির্বিশেষে করে চলেছে ধ্বংস,  
হায়রে মানবজাতি! কতটা আজ নৃশংস।।

আজ তাই প্রকৃতি হয়েছে রুষ্ট  
আর মানবজাতি তারই ক্রোধে আবদ্ধ,  
চলে যাচ্ছে কত প্রাণ,  
আজও নেই কোনো পরিত্রাণ।।

তাই এসো আজ আমরা হাতে মেলাই হাত,  
ভুলে যাই জাতপাত;  
জানি, প্রায়শ্চিত্ত হয়তো হবে না -  
তবু আমাদের লড়াই থামবে না।।

হে বিশ্ব, হে ধরিত্রীমাতা,  
এবার শান্ত হও-  
ক্ষমা করে সন্তান স্নেহে,  
আবার মোদের আগলে নাও।।

## ইকরাশ

রূপায়ন সাহা

উড়তে গেলে ডানা থেকে মানুষ ঝরে পড়ে  
ফুলের মত, কিন্তু ডানায় আঘাত লাগে প্রতিক্রিয়া বলে;  
হালকা শরীর নিয়ে বহুক্ষণ ভেসে থাকা যায় এরপর  
ভেসে থাকা যেত অনেককে সঙ্গে নিয়ে, তবে  
উড়তে উড়তে বিচলনে মানুষ ঝরে পড়ে যায়।

কিছুটা সময় ওড়া, তারপর ভেসে চলা-একাকী, নির্জনে,  
ভাসমান অবস্থাতেই পুনরায় মানুষেরা প্রতিস্থাপিত হয়,  
ডানায়  
সহন-সীমা অতিক্রম করে গেলে একে একে তারা খসে  
পড়ে।  
এইভাবে বহুদূর ওঠা যায়, বারে বারে পর্যায়ক্রমে।

উড়তে উড়তে একসময় লক্ষ্যের খুব কাছে এসে  
সচেতন দৃষ্টি পড়ে, আত্মসমীক্ষার খাতিরে;  
দূদিকে বিস্তৃত ডানা-একটি মানুষও নেই তাতে!

এমত আবিষ্কারে ডানা দুটি পুড়ে যায়, ছাই।  
সবদিকে শূন্য শুধু, শূন্যের ভিতরে কিছু নাই।



## প্রত্যাবর্তন

প্রাপ্তি মুখার্জী

আবার আসব ফিরে এক বসন্তে,  
যখন মোড়ের অমলতাসে ভরে আসবে ফুল;  
পথে থাকবে চাঁপা ফুলের ঘ্রাণ;  
আর তোমার চিরপরিচিত স্পর্শ।  
সাক্ষী থাকবে পূর্ণিমার চাঁদ।  
উঁচু থেকে দেখা আকাশও থেমে থাকবে,  
আবার আগের মতো-  
হাতে হাত রেখে চুপ করে শুনব-  
ঐ বুঝি এক প্লেন চলেছে তার গন্তব্যে,  
ঐ বুঝি এক রাতচরা পাখি গেল উড়ে।  
ভালোবাসা ও আশ্বাস ঘিরে থাকবে,  
হাতের মুঠোয় ও কাঁধে রাখা মাথার শাস্তিতে।  
আবার আসব আমি। ফিরব তোমার কাছে।  
তখন একমুঠো অকালের শিউলি  
দেবে তো আমায়?



## প্রিয়তমাকে লেখা আমার চিঠি

বিধান কুন্ডকার

প্রিয়তমা,  
আমার পুরোনো ছবি দেখিনা আর,  
যেমন দেখি দৈনিক বারবার  
আয়না খুঁজে আমার ভুঁড়ি।  
ফাস্টফুড বাদ, চলছে মুড়ি!  
মেদের বহর কমবে কি তাও?  
মেসের কুকের তেলের যা ভাও!  
মাঝে মধ্যে মন চায় খুব, যাই  
গর্জে বলি, “হচ্ছেটা কি, ভাই?  
সবজি বলে আলু চালাও,  
জলের মধ্যে তেল মেশাও!”  
এমনি করে খাবার খেলে,  
মেদ কি ঝড়বে কোনোকালে?  
আমার আবার জিনের দোষে  
ভাত রুটিতেও ফ্যাট শোষে।  
সত্যি বলছি, লাঞ্চ-ডিনারে  
করি আলুর মশলাহরণ,  
একপিস রুটি, এইটুকু ডাল  
এটাই আমার খাবার ধরন।  
আমার ফেলা আলুর ভারে  
ফাটল ধরল ডাস্টবিনেতে,  
তুমিই বলো, করবোটা কি?

আমার কি দোষ আছে এতে?  
ফুড কমিটির বদান্যতায়,  
তেলের বহর মেনুর মাঝে  
দেখেই আমার গা জ্বলে যায়,  
চুপ থাকি তাও, মুখটা বুজে।  
হঠাৎ যখন পড়ে মনে,  
কান্না আসে চোখের কোনে  
ছোট্ট আমি আর নকুর নন্দী  
সন্দেশেতে মনটা তখন বন্দী  
ওসব এখন অতীত, বললে তুমি হেসে  
“হৌদোলকুতকুত, এবার পেটটা যাবে ফেঁসে”  
লজ্জা পেয়ে ওই কথাতে  
চেপ্টা শুরু ভোর রাতেতে  
কিন্তু খুবই কঠিন এ কাজ,  
স্পষ্ট বলছি ঝেড়ে সব লাজ...  
মেদ ঝরানো বড্ড কঠিন  
যতই মানি কঠিন রুটিন।  
তুমি বরং মানিয়ে নিও  
হেসে হেসে রিপ্লাই দিও  
লোকে না হয় বলুক মোটু  
ভালো থেকো! ইতি, তোমার ঘোটু।



## THE JOURNEY

Shaheerah Shahid

I would be lying if I said I've been alright,  
learning that I ain't good enough,  
losing every fight,  
The insecurities and failures weigh down hard,  
but "you can't be sulking living what someone  
else's dream" duh!  
Being misunderstood doesn't bother me  
anymore,  
Being where I am doesn't excite me like  
before.  
The strive for more is over whelming,  
a story without an ending.  
While they advertise all that's good, to the  
point I am convinced I am blind,  
unable to see what's true.  
The tunnel is dark and cold;  
There is no end.  
The journey continues;  
So long, my friend.



## ESSE OF LIFE

Let not these moments fade,  
let not the past cascade,  
It's failures and insecurities,  
upon the future's happy serenade.  
Let not your dreams sink,  
into the depths of past cries,  
while you're still on the brink,  
remember, you can fly.

## THE COLOUR OF LONELINESS

Santanu Mukherjee

I watched the street  
lonely with a yellow light  
when a gentle wind  
carried the distant whispers!

Along with a fading noise  
it carried a obscure voice -  
with all these so fulfilling  
I am still missing something!



Looking at the star over the sky  
and touching the breeze passing by  
I found my heart, being  
empty like a looted cart!

just like the street below  
I am lonely - I am low!  
With the growing darkness  
yellow becomes  
the colour of loneliness!





## THE TRAVELERS

Santanu Mukherjee

Oh my mother, Earth  
what would happen  
if nothing adds up ?

What would happen if  
a river destined to reach  
sea, loses its flow before the beach ?

What would happen if  
a bird, out for a great migration  
loses its way in dry desert sand  
and the folk never mention ?

What would happen if  
A man strong in will  
Compelled to bow down  
and sit beneath the hill  
of misfortune!

I know, no one would care  
the difficulty, that the traveler has to bear!  
or whether the play was fare and square!  
Destiny is all that matters, here!

But oh my mother, Earth  
Will you remember ?  
The fire of will that  
they set in their heart ?



## PARALLEL

Sayanti Mondal

Suddenly I find you in the crowd  
Although you were always in the world,  
What you speak, what you show  
Feels so soothing just like snow.  
When you look the nature in your way  
Feels it's another body with my own eyes.  
Whatever you say, are the words of mine.  
What you sing, are the songs I want to  
hear.

how you enjoy the rain, is the feeling I want  
to feel.

The way you see the life, I want to live ...

We have never met before, why you feel  
so known ?

We resonate although you are calm and  
me windy, how !

We are so different but we are so alike ...

It's like walking the same way with the  
same direction.

While walking on the ups and downs of  
life,

Even if everything goes foggy again with  
the time going.

Even if I can't find you again with the life  
progressing.

I hope you will always be with me with the  
same closeness.

Just like the parallel lines on a paper, but  
the irony is

We shall neither be apart nor be crossed.



## ‘बाल दिवस’ की शुभकामनाएं

रेनू सिंह

हिंदी सहायक अधिकारी (राजभाषा)

‘बाल दिवस’ की शुभकामनाएं उनको भी...  
जिनका बचपन पूरा होने से पहले ही चला गया  
जो कभी छत पर अकेले बैठकर  
चांद को एकटक देखा करते  
तारों से बातें किया करते,  
घर के एक कोने में बैठकर  
अपने खिलौनों से खेला करते,  
बचपन से अंजान दूसरी दुनिया में डूबे  
नन्हें, अंजान राहों के पथिक  
शुभकामनाएं उन्हें भी...  
जिन पर समय के पहले आ जाता है  
जिम्मेदारी का बोझ, पालने लगते हैं  
अपने से बड़े कद और उम्र वालों का जीवन  
मांजते हैं बर्तन, बनाते हैं चाय, पोंछते हैं टेबल

चलाते हैं मशीनें, झोंकते हैं कोयला, लगाते हैं ठेले  
बेचते हैं गुब्बारे, गुलाब, स्ट्राबेरी, सजावट के सामान  
बड़ी सड़क पर नंगे पैर, गाड़ियों के पीछे दौड़ते हुए  
कहते हैं  
‘ले लो ना मैडम...ले लो..ना..बहुत अच्छा है’...  
जेब्रा क्रॉसिंग की ‘ब्लैक एंड व्हाइट’ पट्टियों पर  
हर दिन बेरंग बचपन जीते हुए...  
शुभकामनाएं उन्हें भी...  
जिनके लिए सुबह उठने से पहले ही तैयार रहता है  
नाश्ता  
खड़ी रहती है कार, स्कूल ले जाने वाला नौकर  
स्कूल से आने के बाद मिलने वाली पेस्ट्री, केक,  
बर्गर, कोल्ड ड्रिंक  
टैब, मोबाईल वगैरह वगैरह ...  
‘बाल दिवस’ की शुभकामनाएं उन्हें भी...

## सर पढ़ा रहे हैं!

सुदीप चक्रवर्ती

सर पढ़ा रहे हैं!

कभी पास से, कभी दूर,  
अलग-अलग रूप में, अलग-अलग नाम से,  
अलग-अलग विषयों में।

गवाही देता है इतिहास!

प्राचीन भारत का गुरुकुल हो,  
या मध्ययुगीन यूरोप का मोनास्टेरी।  
शिक्षा थी, प्रगति थी,  
और हमेशा उनके साथ थे वह।

हाँ, सर पढ़ा रहे हैं।

हाँ, मेरे सर.

स्कूल में, कॉलेज में या ट्यूशन में,  
घर पर, या रास्तों में ...

और न जाने कितने ठिकानों पर।

वो मुझे, हमें, सिखाते हैं।

जटिल से जटिल विषयों को सटीक ढंग से समझाते हैं।

या कम से कम कोशिश करते हैं,

प्रेरणा देते हैं सच्चा इंसान बनने के लिए।

— कौन ? कौन कह रहा है ये बातें ?

— मैं।

— कौन ? कहाँ रहते हो ?

— मेरा घर है वर्धमान, या शायद बांकुड़ा, नहीं,  
बीरभूम

मेरा घर है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई भी ...

मेरा घर पूरे भारत में है, नहीं, पूरी दुनिया में !

सुबह के आठ बज चुके हैं।

गाँव का बाज़ार भीड़ से गूँज रहा है,  
शहर की रफ्तार तेज़ होती जा रही है।

सर पढ़ा रहे हैं।

कभी बच्चों-सी मीठी मुस्कान लिए,

कभी शेर-सी गंभीरता में डूबे हुए।

कभी दोस्त, कभी मार्गदर्शक, कभी दार्शनिक बनकर,

सभ्यता के पवित्र कार्य में जुटे हुए।

उनके कंधों पर है एक बड़ी-सी जिम्मेदारी,

और ढेर सारी सच्ची उत्सुकता।

— कौन ? कौन कह रहा है ये बातें ?

— मैं ?

— कौन मैं ? हिंदू, मुस्लिम—क्या है तुम्हारा धर्म—

— मैं हूँ हिंदू, मैं हूँ मुस्लिम !

मैं हूँ ब्राह्मण, मैं हूँ सुन्नी।

मैं हूँ विद्यार्थी ! यही है मेरे पहचान...

मेरा कोई धर्म नहीं, जाति नहीं।

दोपहर के बारह बज चुके हैं।

गाँव की गलियाँ कुछ शांत हैं,

शहर की हलचल अभी बरकरार।

सर पढ़ा रहे हैं!

एक के बाद एक क्लास ले रहे हैं,

स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में...

या शायद सामान्य लोगों की तरह  
चिलचिलाती गर्मी में काम कर रहे हैं,  
वह भी जाने-अनजाने पढ़ा रहे हैं।  
निरंतर परिश्रम से समाज को गढ़ने का कार्य,  
उनके कंधों पर थमा हुआ है।

रात के नौ बज चुके हैं।  
गाँव अब पूरी तरह शांत है,  
शहर भी कुछ ठहरा सा लग रहा है।  
सर पढ़ा रहे हैं।  
शायद अब वो सामने नहीं,  
लेकिन किताब के हर पन्ने पर,  
हर पंक्ति के बीच,  
हर दो शब्दों के बीच की शून्यता में वह हैं।  
वह हैं, हमारे दिलों में बसे हुए।

हाँ, सर अभी भी पढ़ा रहे हैं।

— कोन सर ?  
— मेरे या आपका, सर या मैडम।  
या शायद कोई सामान्य व्यक्ति,  
माँ-बाप, कोई बच्चा, मित्र, दुश्मन...  
या शायद कोई जानवर !  
— और तुम ?  
— मैं एक छात्र, या छात्रा।  
बीते कल का, आज का, या आने वाले कल का...  
मैं, या आप ही हैं ये देश,  
इस देश का अतीत, वर्तमान, भविष्य।  
और वो हैं मेरे शिक्षक, मेरे कारिगर।  
हाँ, सर पढ़ा रहे हैं !  
सर पढ़ा रहे हैं ॥

## রাগ - রাগিণীর খেলাঘর

### অর্পিতা জানা

তুমি বিরাজ করো ইমনের সন্ধ্যাকালীন স্নিগ্ধতায়।  
রত তুমি ভৈরবের আপন গান্ধীরে।  
ছকে বাঁধা জীবনের রক্ষ মরুকে  
সিঁক্ত করেছো তানপুরার সুরে তোলা খেয়ালের মুগ্ধতায়,  
আলাপের সাযুজ্যে।  
তোমার দর্শন আজ বিলম্বিত -  
তবু তব স্মৃতি আজও সযত্নে রক্ষিত  
ভৈরবীর মমতায়, বৃন্দাবনীর প্রেমে  
আজও জর্জরিত।  
“নহবতে আমি প্রাতে আশাবরী,  
সাঁঝে কাঁদি আমি ভূপালী।”

ছিন্নবীণার তারে বেহাগ — বাহার  
ওঠে সুর তুলি ॥  
সানাইয়ের করুণ সুরে যখন ওঠে কান্নার রোল,  
ধ্রুপদ তখন বলে ওঠে, “এ সবই মনের ভুল।”



## শোভন দেব মণ্ডল

## উলটোপুরাণ

এই অখণ্ড অবসর এ জীবনে কি  
 আর পাওয়া যাবে?  
 বর্তমানের তীরে দাঁড়িয়ে  
 ভবিষ্যতের অকূল সমুদ্রে পথ খোঁজা অবাস্তব।  
 তবু পিছনে ফেলে আসা পথের দিকে তাকালে  
 সামনের পথটা কিছুটা অনুমেয় হয়।  
 নদী এক কূল গড়ে আরেক কূল ভেঙে।  
 কিন্তু এই ঐতিহাসিক ক্ষণ গড়ছে  
 এক কূল আরেক কূল অক্ষত রেখে।  
 সত্যি কি এ সম্ভব -  
 নাকি এও আরেক ভ্রান্তি।  
 মহামূল্যবান যে সময়, আসলে তারই খতিয়ান  
 লুকিয়ে রয়েছে আপাত অক্ষতাবস্থার আড়ালে।  
 সময়কে ধরলে একটা সমান্তরাল চলমান মাপকাঠি  
 এই প্রথম বোধহয় সে এগোলেও  
 আমরা পিছিয়ে পড়ছি না  
 এই প্রথম নির্মল বাতাস, নীল আকাশ  
 নরম আলোর সকাল গুলোকে আমরা  
 ব্যস্ততাহীন প্রশান্তির ওমে আত্মস্থ করছি।  
 এই শান্তি গ্রীষ্মের সভ্যতার প্রভাবের মতো  
 ছড়িয়ে পড়ুক আরও হাজার বছর  
 সামনের পৃথিবীর উপর।  
 ব্যস্ততার ভিড় আজ বিপরীত গতিতে  
 ব্যাপ্ত হোক অখণ্ড অলসতার শূন্যতার মধ্যে।

## গম্ভব্য

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাত্রা গুলোর গুরুত্ব অশেষ।  
 কে জানে প্রত্যেকটি সফল যাত্রাই  
 দিন বদলের গল্প লেখে কিনা,  
 তবে সফলতাই সেখানে একমাত্র কাম্য।  
 দুই গন্তব্যের মাঝে পড়ে থাকে  
 যে পথ সেখানে ক্ষণিকের থামা

দিয়ে যায় অচেনার অনাবিল তৃপ্তি।  
 অদেখা সৌন্দর্যের কয়েক বলক  
 আর তার নিঃশব্দ আহ্বান উপেক্ষা করে  
 আবার চলতে হয় কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের দিকে।  
 সেখানে পৌঁছেও অপেক্ষা আরেক যাত্রার  
 ফিরতি পথে কিংবা নতুন কোনো,  
 এই যতিহীন চলায় মানুষ চির মুসাবির।  
 ভিন্ন ভিন্ন রঙের মন, কখনো মেঘ  
 কখনো রোদ্দুর, কখনো কার্তিকের ভোর  
 কখনো বৈশাখের গোখলি অন্তরেও যেন  
 শুধু একটা থেকে আরেকটায় যেতে চাওয়া।

## নবীকরণ

যাওয়া মানে তো শুধু যাওয়া নয়,  
 যাওয়া মানে ফিরে আসাও বটে।  
 যাওয়ার আগে জমে ওঠে যত চিন্তার প্রলেপ  
 যত হিসেব নিকেশের না মেলা অঙ্ক  
 যাওয়ার পর তার শূন্য কক্ষে  
 হয়তো বেঁচে থাকে কিছুক্ষণ ভাইরাসের মত।  
 কিন্তু তারপর ঠিক উবে যায়  
 ফিরে এসে নতুন লাগে সবকিছু।  
 যারা যায় তারাই তো ফিরে আসে  
 ফেলে যাওয়া মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, ধানক্ষেত  
 ফেলে যাওয়া উঠোন, দাওয়া পথঘাট  
 সবই আসলে নিয়ে যাওয়া সাথে করে  
 সময়ের চিরস্থায়ী চিহ্ন লালন করে হৃদয়  
 জয় আর পরাজয়ের মিথ্যে অঙ্কে  
 রয়ে যায় শুধু যুদ্ধ গুলোর স্মৃতি।

## ফাগুন

দু চোখ তাকে আজও খোঁজে  
 পাতা ঝরার এ মরশুমে  
 যে শূন্যতা ওই রিক্ত শাখায়  
 কখন না জানি হৃদয়ে জাগে।

পত্রসজ্জা বেছানো আজও  
বনের পথ ঢেকে দিয়ে  
শুধু চরণ তার আর পড়ে না  
শুকনো পাতায় নূপুর বাজিয়ে

আজ সেও খোঁজে আমায়  
প্রতীক্ষা তারও ব্যাকুল হয়ে  
আরেক ফাগুন ওই চলে যায়  
জানিনা কেনো থাকি পিছিয়ে।

দুজনেই যে দুজনকে খুঁজি  
তবু আমার খোঁজা গানের সুরে  
তার মনেতে বাস নেবার পরেও  
তাই যে থাকি কেবলই দূরে।

## সময়

### অঁকিতা রোজড়িয়া

উসনে জগায়া মঁ নহীঁ জাগী।  
উসনে ফির झकझेरा, মঁনে उसे झटक दिया।  
वह चिल्लाया, मँने कानों में रुई डाल ली।  
तभी मँ उनींदा से उठी और देखा वह जा रहा था।  
मँने पुकारा, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा।  
मँ चिल्लाई, वह अनसुना करके चला गया।  
मँ बहुत रोई, मँ बहुत पछतायी।  
किन्तु वह आज तक लौट कर नहीं आया।  
जानते हो वह कौन था –  
वह “समय” था।

## यादों का कारवां

### अंकिता रोजड़िया

दो पल का था काफिला,  
...हँसता, मुस्कराता, गुनगुनाता।  
कुछ पल साथ चला तो लगा दुनिया मेरी कैद में है,  
फिर अचानक एक तूफान आया,  
और... उजाड़ ले गया मेरी दुनिया उसी एक पल में।  
छूट गयी सारी बातें बस यादों में,  
अब ना वो काफिला है ना ही वो बात।  
न जाने कब लौटेंगे वो दिन एक बार फिर,  
दिन काटें नहीं कट रहे रात में नींद नहीं,  
ख्वाबों में बस एक ही ख्याल—  
क्या कभी फिर लौटेगा वो यादों का कारवां,  
या  
गुजर जाएगी जिंदगी इन्ही यादों के सहारों ॥

# মিলন ভূমি

সায়ন ঘোষ

ভারত আমার জন্মভূমি, সকলেরে দিল ঠাই  
যেথায় হিন্দু-মুসলমান আপনার ভাই ভাই।।  
গীতার শ্লোকে, কোরানের আয়াতে মুখরিত আমার দেশ  
সবই যে মোক্ষলাভের উপায় - শুনতে লাগে বেশ।।  
সন্ধ্যা ঘনায় ঘণ্টা-ধ্বনি, কাঁসরে  
মনোনিবেশ হয় মাগরিবের আসরে।।  
দুর্গাপূজা, দীপাবলি সবাই আনন্দে সামিল  
ঈদেতেও হয়না তার অমিল।।  
স্বাদে-গন্ধে বিরিয়ানী হয়না তুলনা  
শেষ পাতেতে পায়ের চাই- দিতে যেন ভুলনা।  
সীমানায় দাঁড়িয়ে বিশাল সৈন্যদল- ভারতমাতার প্রাণ  
বলতে কি পারবে- কে হিন্দু কে মুসলমান?  
একই মাটিতে জন্ম মোদের, একই সাথে বাস  
একটাই মূলমন্ত্র- সাম্প্রদায়িকতার নাশ।।

তবু খামতি নেই সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপনে  
আমরা হিন্দু ওরা মুসলিম- এরূপ ধারণার রোপণে  
কিছু ভণ্ডের ধর্মীয় গোঁড়ামিতে বেঁধেছে মানুষে মানুষে  
যুদ্ধ  
তাই বুঝি মায়ের নিশ্বাস আজ হতে বসেছে অবরুদ্ধ।।  
দাঙ্গা চলছে, প্রাণও হারাচ্ছে মুসলমান কিংবা হিন্দু  
আক্ষিপ একটাই- বারছে শুধু লাল বর্ণের রক্তবিন্দু।।  
স্বাধীনতার প্রাক্কালে কলকাতার রাস্তায় রক্তের বন্যা  
ঝরেছিল কত স্বজনহারা মানুষের হাহাকারের কান্না।।  
অযোধ্যার পূণ্যভূমিতে শায়িত কত নিখর দেহ  
মানুষ আজ মানুষকেই করছে বড়ো হেয়।।  
যুগ যুগ ধরে মামলা চলল, সবার স্বার্থের হল জয়  
বুঝি শুধু দৃষ্টান্ত হয়ে রয়ে গেল মানবতার অবক্ষয়।।  
দাঙ্গা হাঙ্গামায় রক্তাক্ত আমার দেশের মাটি  
ওরে তোরা ভুলিসনে- তোরাই মায়ের পথ চলার লাঠি।।

হে প্রভু, আরেকবার তুমি এ গরল করো গলাধঃকরণ  
যেন আর নেমে না আসে এ শোকস্তব্ধ মরণ।।  
আমার দেশ রয়েছে বিবেকানন্দের উদাত্ত বাণীতে  
এপিজে আব্দুল কালামের মতো রাষ্ট্রপতির ধ্বনিতে।।  
এখানে মন শান্ত হয় রবীন্দ্রনাথের গানে  
প্রতিবাদী হয়ে ওঠে কবি নজরুলের কবিতার বানে।  
দর্শকরা উল্লসিত সচিনের ব্যাটে  
জাহির খানের নেওয়া উইকেটে।  
এ মাটি সমৃদ্ধ মহামতি অশোকের শাসনে  
আকবরের আইন-ই-আকবরির সম্ভাষণে।।  
রফি সাহেব, মহম্মদ ইকবালের সুরে বানভাসি হয় মন  
কিশোর কুমার, মান্না দেব গান সে যে অমূল্য ধন।।  
খুঁজলে পাবে এমন হাজারো উদাহরণ  
সবাই মায়ের স্নেহধন্য, লভিল মায়ের চরণ।।

মায়ের মুকুট শ্বেতশুভ্র বরফে আচ্ছাদিত  
গলার হার তাজমহলের প্রেমসুরে খচিত।  
এক হস্তে বিস্তৃত মরু বালুরাশি  
অপর হস্তে সবুজ ঘেরা প্রান্তরে গঙ্গার হাসি।।  
কোমরবন্ধনী বিক্ষ্যাচল  
পায়ের নুপুর ভারত মহাসাগরের জল।।  
মায়ের পরণের শাড়ি ঐক্যতার সুতোয় বোনা  
কত মানুষ মিলে হল একাকার, যায় কি তা গোনা।।  
এটাই আমার ভারতবর্ষ- এক আত্মা, এক প্রাণ  
একের বিপদে অন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে করতে পরিব্রাণ।।  
একশো তিরিশ কোটির মহান দেশে রয়েছে শুধু  
সাম্যতার বাণী,  
এখানেই আমার দেশ সকলের থেকে সেরা- মনেপ্রাণে  
মানি।।

## জ্বলন্ত নিরবতা

কৌশিক দাস

দেখিতাম সেই ধূসর মাঠে  
দূর দিগন্ত মিশে যেত কমলা আভার  
সাথে।

সদ্য নিদ্রাভঙ্গ বালকটিকে  
চমকিত করে ভোরের আগমন  
হঠাৎ সে জানতে পারে  
সন্ধ্যে এখন।

কখনো লাঙল, কখনো ধনুক  
পাখিরা দেশে ফিরে যায়  
নববধূ তখনও লাজুক।

হৃদহৃন্দে প্রেমমুগ্ধ এক বালক-বালিকা  
মধুর গঞ্জে, স্নিগ্ধ বাতাসে পড়ে না  
চোখের পলক।  
আটকে রেখে অনেক কাজ পেরিয়ে  
অনেক বাধা  
ফুটে ওঠে প্রকৃত ভালোবাসা।

এই সেই অগভীর নদী  
যেখানে ডুবেছি আমি  
নেই এর কুলকিনারা  
কখনো দুঃখ কখনো হাসি।

সাঁতার কাটছি তখন থেকে  
মনে হয় না এগিয়েছি আমি  
নীল জলকেও দেখছি সাদা।  
মুখ থেকে হারায়নি কিন্তু হাসি।

অতি কষ্টে ভেসে আছি  
এই নীচে টানলো বুঝি।

কষ্ট যারা সময়গুলো  
সুখের হাসি দেখবার আশায়  
অতীত ভুলে গিয়ে আবার  
আমি সেই জলের অপেক্ষায়।

নীল বাতাসে ভরেছে আকাশ  
হলুদ রক্তের আগুন  
আমার করেছে সর্বনাশ।  
চিড়িয়াখানার কেঁচোর মত কাটিয়েছি জীবন  
আমার হাতের পাথরটি অন্য নদীতে ডুবেছে এখন।

এক পায়ে জুতো পড়ে ঘুরেছি এই জগৎ  
দেখিনি স্বার্থহীন হাসি  
সৃষ্টির আনন্দে হয়েছি উন্মত্ত  
কচুর গাছে লাগিয়া ফাঁসি।



## শেষ যাত্রা

শিঞ্জিনী পাল

কু ঝিক ঝিক ট্রেনের গাড়ি পেরিয়ে গেলো মাঠ,  
 বাম দিকে ওই স্টেশন ছেড়ে এবার পুকুর ঘাট  
 পশ্চিমে ওই ঢলছে রবি, উঠছে ফুটে তারা,  
 কৃষক সকল ফিরছে ঘরে কাজ হলো তার সারা।  
 জানলা পাড়ে বসে বসে আকাশ কুসুম স্বপন  
 ছুটন্ত সব দৃশ্য মালা করছি চোখে বপন  
 গল্পেতে কেউ মশগুল, কেউ মুঠোফোনে বন্দি  
 ফিরবো ঘরে তাড়াতাড়ি এইতো অভিসন্ধি।  
 হঠাৎ করে কি যে হলো থমকে গেলো সব  
 চারদিকে তে উঠলো ফুটে ক্রন্দনের এই রব।  
 উল্টে গেলো পাল্টে গেলো, চারিদিকে রক্ত,  
 মানুষ নাকি খোলাম-কুচি আজকে বোঝা শক্ত।  
 ট্রেনের উপর ট্রেন চেপেছে, কামরা গেছে প'রে  
 ট্রেন লাইনের পাত গুলো সব এদিক ওদিক স'রে।  
 কাঁদছে মানুষ, ছুটছে মানুষ প্রিয়জনের খোঁজে  
 ভিড়ের মাঝেও সবাই যেন ব্যাকুল ভাষা বোঝে।  
 এদিক ওদিক জামা কাপড় চাপা নিথর দেহ  
 কয়েক শত স্বপ্নগুলো ফিরবে না আর কেহ।  
 শত শত জুপ মাঝে এক রক্ত মাখা খাতা  
 একতরফা ভালোবাসার ছন্দে ভরা পাতা  
 হয়তো তুমি খাতা খানি কুড়িয়ে নেবে এসে  
 কিন্না হয়তো দেখছ হেসে দূর তারাদের দেশে  
 অভিযুক্ত যাত্রা শেষে স্বজন হারার ভয়  
 নাম বিহীন এক ভালোবাসার করিয়ে গেলে জয়।

June 2, 2023 উড়িষ্যার বালাসরে ঘটে গিয়েছিল এক  
 ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। ২৯৬টি তাজা প্রাণ চলে গিয়েছিল সেই  
 দুর্ঘটনায়, বহুজন হয়েছিল আহত। ভারতের ট্রেন দুর্ঘটনার  
 ইতিহাসে এটা ভয়ঙ্কর ট্রেন দুর্ঘটনাগুলির মধ্যে একটি হয়ে  
 রয়ে যাবে। এই দুর্ঘটনা থেকে আসা খবর, দুর্ঘটনা স্থলের ছবি  
 এই সকল কিছু আমাদের গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল,  
 সেই নিয়ে আমার এক কবিতা।

## BIZARRE রিত

সুতনু মুখোপাধ্যায়

জোনাকিরা বয়ে নিয়ে চলে আঁধারের শব,  
 বালিঘড়ি এসে থেমে যায় মোহনায়।  
 সময়ের ক্যাকোফোনি সহসা হয় নীরব,  
 যেভাবে সব নদী একদিন গাছ হয়ে যায়।

হ্যালোজেন বাতি জ্বলে তারাদের মিছিলে,  
 ছায়াপথ জুড়ে থাকে উভচর সূর্যের প্রহর।  
 কিউমুলোনিম্বাস্ এসে মেশে নীলে,  
 আর সাবল্টার্ন মেঘে ঢেকে যায় শহর।

কবরের শ্বাসমূলে ফেলে রেখে ইতিহাস,  
 পরিযায়ী শালিখেরা ঘরে ফেরে অসময়।  
 কানাগলি বেয়ে চলে স্মৃতির এক্সোডাস,  
 সব রূপকথা কবে যেন এপিটাফে মিশে যায়।

ব্যালাডেরা ভেসে চলে লিমেরিক ছন্দে,  
 যাযাবর শব্দেরা শৃঙ্খলিত হয় কবিতায়।  
 কুয়াশা সৌধ ভাঙে বাতাসের গন্ধে,  
 সন্ধ্যার সমার্থক তো শুধু মৃত্যু-ই হয়!



## মাতকাহন

সুদীপ চক্রবর্তী

### ১. দিলকশি (আকর্ষণ)

বাংলার টিউশনে সেই প্রথম দেখা  
তুমি জানালার বাইরের দিকে চেয়ে!  
নতুন শহরের ব্যস্ততায় স্তব্ধ দুখানি চোখ  
জীবনানন্দ দাশের ‘বনলতা সেন’ মনে পড়ল  
“মুখে তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য”  
নীল চুড়িদারের ওপরে সাদা ওড়না  
কালো ঘন চুল, এক মৃদু মিষ্টি সুবাসে ভরা  
পাশে দাঁড়িয়েও মনে হল অসীম এই দূরত্ব  
থমকে গেল আমার মন, চুপ করে রইলাম  
মনের ভিতর কতো স্বপ্ন আসতে লাগল।  
সেই ফাঁকে অচেনা কারুর কিছু প্রশ্ন  
তুমি অল্প কথায় দিলে দুটো-একটা জবাব  
সেই আওয়াজে মন ভরে উঠল আমার  
নিজে কথা বলার সাহস হয়নি বহুদিন,  
শুধু প্রতি রাতে চোখ বুজলে তুমি আসতে কাছে  
তোমার মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতো,  
কতো কথা বলতাম দুজন মিলে।  
তারপর কতদিন গেল এই ভাবেই!  
ভাবিনি কোনোদিন হবে সম্ভব  
তবু একদিন হঠাৎ খুলে গেল দরজা,  
তুমি এসে নোটস চাইলে আমার কাছে  
কেমন গলা কেঁপে উঠল আমার।  
আনন্দে সেই রাতে আর ঘুম এলো না  
অদৃষ্টকে জানালাম ‘ধন্যবাদ’।

### ২. উল (মোহ)

এতগুলো মাস পেরিয়ে গেল কত তাড়াতাড়ি  
এখনও সাহসের অভাবে বলা হয়ে উঠল না;  
কোথাও একটা ভয় কাজ করে মনের ভিতর।  
দূরত্ব কমেছে অনেক; এতো কাছে পেয়েও  
আরো কাছে পেতে মন চায়।  
এই ছোট সত্যিটা অবলীলায় বলতে পারিনি  
শুধু চেয়েছি সারাদিন পাশে থাকতে।  
কতো গল্প হয় এখন, কতো কথা  
কতো অজুহাত একসাথে থাকার,  
নোটস দিতে যাওয়ার অছিলায়  
আমি দাঁড়িয়ে তোমার হোস্টেলের বাইরে  
তুমি দোতলার বারান্দায়,  
তারপর চোখে চোখ পড়লে তোমার মিষ্টি হাসি...  
এতো প্রিপারেশনের পরেও কেমন অপ্রস্তুত আমি।  
তারপর এইভাবেই দিন গেল  
অমার হল টাইফয়েড; হপ্তাখানেক গৃহবন্দী  
কতও গালিগালাজ অদৃষ্টকে, কটা মাত্র দিন  
যেন শত সহস্র বছর হয়ে উঠল।  
আবার ফিরলাম শহরে; সেই বাংলা টিউশন  
হঠাৎ হাত চেপে ধরে জোরালো একটা আওয়াজ,  
“এতোদিন কোথায় ছিলে? কতো মিস করেছি তোমায়।”  
“না মানে টাইফয়েড...”  
অদৃষ্টের কাছে তখনি চাইলাম ক্ষমা,  
তার অভিসন্ধি স্পষ্ট বোঝা গেল।  
মাঝে মাঝে শরীর খারাপ হওয়ার প্রয়োজন আছে বইকি।

### ৩. মোহাব্বত (প্রেম)

তারপর আরও কাটলো দিন  
এখন আর আমি একা অপেক্ষা করিনা,  
টিউশন শেষে তুমিও দাঁড়াও রাস্তায়  
একসাথে হেঁটে যাওয়ার জন্য।  
বিকেল বেলার ফুচকা, পার্কের বেঞ্চিতে আড্ডা...  
সিনেমা হলের অস্পষ্ট গাঢ় অন্ধকারে  
যখন তোমার চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম  
তোমার দুখানি চোখ কোনো এক প্রবল আবেশে  
তাকিয়ে ছিল আমার দিকে, তা আমি স্পষ্ট দেখেছি।  
এখন সেই অর্থে আর তেমন রাখঢাক নেই;  
তবু যেটা এতোদিন ধরে বলতে চেয়েছি,  
সে কথা মুখে বলতে সাহস পাইনি, লিখলাম চিঠিতে,  
কিন্তু কি সম্বোধন করবো তা বুঝিনি!  
“তোমার চোখে যেদিন প্রথম রেখেছিলাম চোখ  
জ্যোৎস্না রাতের মিষ্টি চাঁদ, সমুদ্রের ঢেউ,  
রাত জেগে পড়া প্রেমের কবিতার বই,  
আকাশের গাঙচিল আমাকে বলেছিলো,  
আমি তোমায় ভালোবাসি।  
প্রকাণ্ড এক পাথরের উপর একাকী বসে  
এক শাস্ত সকালে সূর্যোদয় দেখার যে সুখ,  
সমুদ্রের নোনা জলে পা রেখে জলকেলি করতে করতে  
এক লালচে গোখুরিতে সূর্যাস্তের যে আনন্দ,  
তাদের হার মানায় তোমার মুখের মিষ্টি হাসি।  
কতোদিন ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে তা দেখেছি,  
শুনেছি তোমার কণ্ঠ স্বর,  
মনের ক্যানভাসে ঐঁকেছি তোমায়।  
প্রথমবারের সেই অস্পষ্ট কথোপকথন,  
যতোটা ভয় সেদিন ছিল, আজও তা একইরকম  
কয়েকটি মাত্র কথা, কিন্তু অবলীলায় বলতে ভয় করে।  
এখনও পূর্ণিমার চাঁদ, আকাশের গাঙচিল  
তোমার কথা বলে; সমুদ্রের ঢেউ  
মিটিয়ে দিতে চায় তোমার আমার সমস্ত দূরত্ব।

তোমার হাত ধরে বলা যায় কতো গল্প  
তবু এই কথা মুখে বলতে পারিনি, তাই এই চিঠি।  
বাকিটা বলবে তুমি... অপেক্ষায় রইলাম।”  
সন্ধ্যাে ভয়ে অনিদ্রায় কাটলো সে রাত,  
পরেরদিন টিউশনে আবার সেই দুখানি চোখ  
যেন একটা আনন্দ লুকিয়ে রাখার ভীষণ চেষ্টা চলছে  
সেই মুখ বড়োই রহস্যময়,  
ওই হাসিটাই কি তাহলে উত্তর?  
টিউশন শেষে বাইরের রাস্তায় প্রতীক্ষা  
তারপর একসাথে হাঁটলাম কত রাস্তা  
কোনো কথা নেই, চোখের দিকে পারিনি তাকাতে,  
রাস্তা শেষ হয়ে এলো সেদিনের মতো।  
অবশেষে সাহস করে যখন তাকালাম,  
কাঁপা নিচু আওয়াজে একটা মিষ্টি আবদার শোনা গেল,  
“আমার কিন্তু এরকম আরো চিঠি চাই!”  
কাঁপা কলায় বললাম, “বেশ”।

### ৪. আকিদত (বিশ্বাস)

গ্রাজুয়েশনের পড়া শেষে বাড়লো দূরত্ব  
দুজনে এখন দুই ভিন্ন শহরে,  
চিঠির আবদার এখন আরও জীবন্ত!  
ভিডিও কলের যুগেও কেউ চিঠি লেখে,  
পোস্ট অফিস খুঁজে স্পিড পোস্ট করে,  
এটা এক অদ্ভুত, কিন্তু সুন্দর ঘটনা।  
“বহুদিন তোমার মুখ সামনে থেকে দেখিনি,  
ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখে চোখ রাখিনি।  
এতো ব্যস্ত শহরে প্রতিদিন ভেঙে যাই,  
ভাঙতে ভাঙতে, ক্ষইতে ক্ষইতে  
তোমার স্মৃতি আঁকড়ে ধরি।  
মাঝে মাঝে তোমাকে মনে হয়  
তপ্ত গরমের দিনে ঠাণ্ডা বৃষ্টি,  
যে বৃষ্টিতে আমি আমার সারা শরীর ভিজিয়ে নিই,  
অথচ এ শহরে বহুদিন বৃষ্টি হয়নি।

বৃষ্টি আসবে একদিন, এটা আমার বিশ্বাস!  
 এই বিশ্বাসের জন্যই বাঁচতে চাওয়া...  
 আশা করি তোমার বিশ্বাসেও ফাটল ধরেনি।  
 দেখা করার জন্য অপেক্ষায় আছি।”  
 চিঠির উত্তর সে কখনও ফোনে বলেনা,  
 আরেকটা চিঠি আসে, আমি জমিয়ে রাখি।  
 “প্রিয়, বিশ্বাস আর স্বাসের তফাৎ নেই আর!  
 ভালোবাসা মানে কি আমি বুঝিনা  
 কিন্তু এটা বুঝি ভালোবাসা রোমান্টিক সিনেমা হলে,  
 বিশ্বাস তার মিস্তি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক।  
 আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক  
 রাতের বেলা আকাশের চাঁদ, তারাদের শোনাই,  
 তার সম্মানে ওরা সারা আকাশ পরিচ্ছন্ন করে তোলে।  
 সেই দৃশ্য যে সুন্দর ছবি সৃষ্টি করে,  
 তা শুধু তোমারই জন্য।  
 আর শুধু তোমার জন্যই  
 বিশ্বাসের প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস।  
 দেখা হওয়ার অপেক্ষায় রইলাম,  
 এতো অপেক্ষা আর সহ্য হয় না।”

## ৫. ইবাদত (ভক্তি)

বহুপ্রতীক্ষার পরে অবশেষে হল দেখা,  
 রেস্টোরাঁর টেবিলে দুটো মকটেলের গ্লাস  
 মুখোমুখি চুপচাপ দুই যুবক যুবতী  
 স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দুজোড়া চোখ  
 কখনও ভেংচি, কখনও মুচকি হাসি  
 চোখে চোখে কথা, আর স্তব্ধতার বিনিময়ে,  
 স্তব্ধতা জানে কতখানি কথা আটকে রেখেছে বুক।  
 “কেমন আছো?”  
 তারপর শুরু বাড়, এতো এতো এতো কথা!  
 রেস্টোরাঁ ছেড়ে সিনেমা হল, তারপর পার্ক।  
 অবশেষে যখন বিদায়ের হল বেলা

আমার দুপায়ে ছুঁয়ে গেল দুই হাত,  
 তারপর ছুঁলো মাথা। চমকে গেলাম!  
 কোথা থেকে যেন ছুটে এল ঝোড়ো হাওয়া,  
 আচমকা প্রণামে শিহরণ এল এ বৃকে।  
 “এই, এটা কি হল?”  
 “ও তেমন কিছু না...  
 আবার কবে দেখা হচ্ছে তাহলে?”  
 দুজনে তাকিয়ে রইলাম কিছু না বলে,  
 মাঝে মাঝে স্তব্ধতা যেন অনেক বেশিই কথা বলে।

## ৬. জুনুন (উন্মাদনা)

আজকাল আর নিজেকে নিয়ে ভাবিনা,  
 কতদিন হল ব্যক্তিগত কোনো স্বপ্ন নেই।  
 ছোটবেলায় চাইতাম, বড়ো হয়ে ডাক্তার হবো;  
 পরে বুঝলাম অতোটা মেধা আমার নেই।  
 তারপরে চাইতাম সিভিল সার্ভিস,  
 সম্মান, খ্যাতি, টাকা-পয়সা, স্বচ্ছল একটা জীবন।  
 সব কেমন পাল্টে গেছে এখন,  
 নিজের স্বপ্ন বলে কিছু নেই আর, যা কিছু ‘আমাদের’,  
 ছোট ছোট কতো স্বপ্ন, কতো দৃশ্যপট!  
 কোনো এক কালবৈশাখীর বিকেলে সারা ঘর অন্ধকার  
 মৃদু আলোয় আমরা দুজন মাখছি ঝালমুড়ি,  
 সাথে দুজনের গান, বেসুরো কিন্তু মিস্তি।  
 আমাদের নতুন বাড়ি নদীর কিনারে,  
 রোজ কাজ সেরে যখন ফিরবো সন্ধ্যায়  
 তোমায় পেয়ে সব কষ্ট ভুলে যাবো।  
 কেমন পাগল হয়ে যাচ্ছি দিন দিন...  
 উন্মাদের মতো ঘুমাতে ঘুমাতে স্বপ্ন দেখে হাসি,  
 সে এক নিষ্পাপ শিশুসুলভ হাসি, বড়োই পবিত্র।  
 মাঝে মাঝে ভোররাতে তোমার কাছে ছুটে যেতে মন  
 চায়,  
 দুটো প্রাণ মিশতে মিশতে যেন একটা হয়ে উঠেছে,  
 দূরত্ব মানেনা, নিয়ম মানেনা, মানেনা বাঁধন...  
 আমার হৃদয়ে বাড়, এক অদ্ভুত উন্মাদনায়।

## ৭. মত (মৃত্যু)

সেবার যখন দুর্গাপূজো হল আশ্বিন মাসে  
দেখা হল দুজনের, হয়তো শেষবার!  
জনলাম বিয়ে ঠিক হয়েছে এই শীতে;  
বাড়িতে সম্পর্ক মেনে নেয়নি,  
“বেকার ছেলে প্রেম করে  
আর পদ্য লেখে হাজার হাজার”,  
কিন্তু খাওয়াবেটা কি?  
তুমিও আর বাড়ির বিরুদ্ধে যাওনি।  
ব্যস, এতোটাই গল্প।  
শেষবারের মতো একটা চিঠি ছিল,  
যেটা কখনও পৌঁছায়নি তোমার কাছে!  
“আমরা আমরা করতে করতে  
‘আমি’র কথা ভুলে গেছি,  
“ইশ্ক জুনুন যব হদশে বড় যায়ে  
হাসতে হাসতে আশিক গুলি চরযায়ে”,  
গানের সুর লয় ছেড়ে যখন কথা শোনে মানুষ,  
সে এক কঠিন সময়।  
যে প্রেমিক বলে ‘ভালোবাসতাম’  
সে আর যাই করুক, ভালোবাসেনি!  
কারণ মৃত্যুর আগে তা কখনও শেষ হয়না।  
আমার বিশেষ কিছু বলার অধিকার নেই আর,  
সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যে শুরু

সেটা অন্যরকম, অদ্ভুত, বিশৃঙ্খল!  
সেখানে মানুষ মানুষের কাছে যেতে চায়না আর,  
স্বপ্ন দেখতে ভয় পায়, স্বপ্নগুলো ক্লান্ত হয়ে ওঠে;  
কিন্তু বেঁচে থাকে, যেমন বাঁচে শহর  
বড় কোনো অ্যাক্সিডেন্টের পরে।  
এখন এই শহরে বৃষ্টি পড়লে  
সেই জলে স্নান করে সারা শহর  
পুরোনো বিল্ডিং, রাস্তাঘাট, ইউক্যালিপটাস  
ওদের গায়ে জমে থাকা ধূলো, ময়লা  
রোদে পড়া হলদে আভা,  
সবই ধুয়ে যায় সেই স্নিগ্ধ শীতল জলে।  
শুধু যায়না মানুষের অর্থই শূন্যতা।  
আর উঠতে চায়না জীবন,  
“হাজারবার মরার আগে মরণ নেই”!  
এ কেমন মরে বেঁচে থাকা বুঝিনা...  
শুধু বুঝি,  
মানুষ এখনও কেন পরজন্মে বিশ্বাস করে।”

*Note : Love has been a central theme in Sufi traditions, articulated through the ‘Seven Stages of Love’, these stages : Dilkashi (Attraction), Uns (Attachment), Mohabbat (Love), Akidat (Trust), Ibadat (Worship), Junoon (Madness) and Maut (Death) eloquently depict the seeker’s path to true love.*



## রাঙা মাটির পথের মুড়োয় ...

পল্লবী রায়

“না না পিসেমশাই, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি পণ্ডিত হবো না পিসেমশাই, আমি পণ্ডিত হবো না  
আমি, যা আছে সব দেখব — কেবলই দেখে বেড়াব।”<sup>১</sup>

এই অমলের মতো অবস্থা কমবেশি আমাদের অনেকেরই। একটু সময় সুযোগ পেলেই সারাবছরের ব্যস্ততার মধ্যে থেকে কিছুটা সময় বার করে ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে পড়ি আমরা। এরকমই একটা বেড়ানোর গল্প আজ আপনাদের সাথে ভাগ করে নেবো।

সময়টা ২০২১ এর শেষের দিকে। দীর্ঘ দুবছর ধরে করোনা আর লকডাউন এর সাথে লড়াই করতে করতে আমাদের হাসফাঁস অবস্থা একেবারে। হঠাৎ ঠিক করলাম, নাহ্ অন্তত দু তিন দিনের জন্য হলেও কোথাও একটু ঘুরে আসতে হবে। যেরকম ভাবা, সেরকম কাজ, আমাদের পরিবার মানে আমি-মা-বাবা-ভাই এবং বাবার এক বন্ধু (আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ কাকু হন) এবং তাঁর পরিবার মিলে হইহই করে বেড়িয়ে পড়লাম ডিসেম্বর মাসের এক রাত্রে।

২৬শে ডিসেম্বর রাত নটা নাগাদ রওনা দিয়ে আমরা সবাই গিয়ে হাওড়া স্টেশন-এ মিলিত হলাম। ট্রেন বেশ কিছুক্ষণ লেট ছিল। যাইহোক অবশেষে পরের দিন ভোরবেলা অর্থাৎ ২৭ তারিখ ভোরবেলা পুরুলিয়া পৌঁছলাম। একে ডিসেম্বর মাস, তার উপর পুরুলিয়া, বেশ মনে আছে ট্রেন থেকে নেমেই প্রথম আমরা সবাই চা এর দোকানে ঢুকেছিলাম। মারাত্মক ঠাণ্ডা ছিল সেদিন।

পুরুলিয়ায় যে রিসর্টটায় ছিলাম, সেটা ছিল একেবারে অযোধ্যা পাহাড়ের উপরে। স্টেশন থেকে অযোধ্যায় পৌঁছতে বেশ কিছুটা সময় লেগে গেল। এই রাস্তার যাত্রাপথের অভিজ্ঞতাটা একদম অন্যরকম। শীতের ভোর, চারিদিক সুনসান, নিস্তব্ধ। এতটাই কুয়াশা চারিদিকে যে চার হাত দূরত্ব থেকে কিছু দেখা যাচ্ছে না! আর তার মধ্যে দিয়ে আমাদের গাড়িটা চলেছে পাহাড়ের ধাপ ঘুরে ঘুরে... মাঝে একটা বেশ সুন্দর ভিউ পয়েন্ট পেয়েছিলাম। সেখানে সবাই নেমে ছবি তুললাম। আমাদের ড্রাইভার দাদা হাত উঁচু করে পাহাড়ের চূড়ার কাছে একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, ওইখানে নাকি আমরা পৌঁছবো। অবাক চোখে চেয়ে

দেখলাম ঘন কুয়াশার আঁচল সরিয়ে দূর থেকে একটু একটু করে ধরা দিচ্ছে পুরুলিয়ার আদিম পাহাড়... আমাদের আগামী দিনতিনেকের গন্তব্য।

এই ৫-১০ মিনিটের বিরতিতে মোটামুটি আমাদের ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার অবস্থা। তাড়াতাড়ি তাই আবার গাড়িতে উঠে বসলাম এবং কুয়াশার চাদর সরিয়ে অবশেষে আমাদের রিসর্টে পৌঁছলাম। ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা বেরোলাম মুরুগুমা লেক আর ভিউ পয়েন্ট দেখতে।



সুইসাইড পয়েন্ট থেকে সুন্দরী মুরুগুমা লেক

যাওয়ার রাস্তাটা প্রায় জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই বলা চলে। দু’দিকে যতদূর চোখ যায় ঘন জঙ্গল আর তার মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা। ড্রাইভার দাদা বললেন, ওই রাস্তায় একদমই রাত করা চলবে না, রাতের দিকে অনেক সময় হাতির পাল একদিকের জঙ্গল থেকে রাস্তা পেরিয়ে আর একদিকের জঙ্গলে যায়। আর রাস্তা এতটাই সরু যে তখন আর কিছু করার থাকে না, হাতি বাবাজিদের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় আটকে পড়ে থাকতে হয়। আর তাছাড়া লেপার্ড বা আরো ছোটখাটো জন্তুও রাতে বেরোতে দেখা যায় ওই অঞ্চলে। রাস্তার পাশে সাইন বোর্ডে সরকারের তরফ থেকে সতর্কবাণীও চোখে পড়ল— এসব মিলে পাহাড়ের বাঁকে ঘন ঘন হারিয়ে যাওয়া অজস্র বুনো ফুলে ঢাকা রাস্তাটাকে এক অদ্ভুত রহস্যে ঘিরে ধরছিল যেন! অবশেষে, প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিট পর মুরুগুমা পৌঁছলাম। অযোধ্যা পাহাড়ের পাদদেশে কংসাবতী নদীর একটি উপনদী সাহারাবার নদীর উপর ‘মুরুগুমা’ গ্রামের কাছে এটি অবস্থিত। চারিদিক পাহাড় এবং জঙ্গলে ঘেরা

<sup>১</sup> অমল (ডাকঘর / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।



একটা বেশ বড়ো হ্রদ আছে এখানে, সূর্যাস্ত দেখতে অসাধারণ লাগে...শুনলাম এটা নাকি পুরুলিয়ার কুখ্যাত ‘সুইসাইড পয়েন্ট’ ও বটে! অবশ্য পাহাড়ের গা দিয়ে যেরকম গভীর খাদ নেমে গেছে তাতে অসম্ভব কিছুই নয়! সূর্যাস্ত দেখে সেদিনের মতো ইতি টানলাম, রিসর্টে ফিরে এলাম।

আমাদের রিসর্টটাই ছিল অদ্ভুত সুন্দর, আগেই বলেছি একদম অযোধ্যা পাহাড়ের মাথায়। চারিদিক পাহাড় ঘেরা, দুপাশে যতদূর চোখ যায় সরু আঁকাবাঁকা পথ চলে গেছে... সেই পথ ধরে আদিবাসী মেয়েরা কাঠ কাটতে যায়, ওদের একটা দলের সাথে আমাদের দেখা হলো, দেখা হতেই উৎফুল্ল হয়ে ডেকে নিলো নিজেদের দলে... ‘আয় না আমাদের সাথে... কাঠ কাটতে যাবি?’ কিন্তু সব ডাকে কি আর সবসময় সাড়া দিতে পারি আমরা?

আমাদের জীবন প্রবাহই তো সায় দিতে চায় না! যাইহোক, যেটা বলছিলাম, আমাদের রিসর্টের কথা, এখানকার ঘর গুলোর বেশ আকর্ষণীয় নাম ছিল, আমাদের ঘরের নাম ছিল যেমন ‘ছৌ’ (পুরুলিয়ার বিখ্যাত ‘ছৌ’ নাচের অবলম্বনে এই নামটা রাখা হয়েছে)। ঘরের দেওয়ালে সুন্দর নিপুণ সব ছবি আঁকা। খবর পেলাম, রিসর্টের মালিক নাকি ওখানে একটা বাচ্চাদের স্কুল চালান, রিসর্ট চালানোর পাশাপাশি ওনার এই মানবিকতা সত্যিই আমার মতো অতি সাধারণ মানুষের কাছে অনুপ্রেরণা।

যাইহোক, পরদিন, ২৮ তারিখ সকাল সকাল আবার যাত্রা শুরু করলাম। প্রথমেই গেলাম পুরুলিয়ার বিখ্যাত টুরিস্ট স্পট ‘মার্বেল লেক’এ। চলতি নাম ‘মার্বেল লেক’ হলেও এর আরো কয়েকটা নাম আছে, যেমন এর চেহারা দেখে অনেকেই একে আমেরিকার ‘গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন’-এর সাথে তুলনা করেছেন, অনেকে আবার বলেন ‘পাতাল



মেঘলা আকাশ ও মার্বেল লেক

ড্যাম’ আবার অনেকে এর ঘন নীল জলরাশির কারণে ‘নীল ড্যাম’ও বলেন। এই হ্রদের উৎপত্তি ও কিন্তু বেশ অদ্ভুত। পৃথিবীর চতুর্থ সর্ববৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ প্রযুক্তির কাজের জন্য বিস্ফোরণ করে পাথর ভাঙতে গিয়ে সেই পাথরের খাঁজে নাকি এই লেকটি তৈরি হয়।

এরপর আমরা চলে এলাম বামনী ফলস্ দেখতে। ফলস্ এর সামনে আসতে কিছু দোকানপাট চোখে পড়লো। তার মধ্যে দিয়েই ঐক্যবৈক্যে সিঁড়ি নেমে গেছে বার্নার দিকে। নামতে নামতেই জলপ্রপাতের হালকা আওয়াজ কানে আসতে থাকে, জংলি খাদের ধার দিয়ে মোটামুটি চারশো সিঁড়ি ভাঙতে হবে, একেবারে নীচে পৌঁছতে হবে। এই বার্নার মূলত দুটি ধাপ আছে, প্রথম ধাপের শেষে পৌঁছতে পারলে এর খুব কাছে চলে যাওয়া যাবে, এমনকি বার্নার জল ও ছুঁতে পারা যাবে। এছাড়া বাকি পথের অধিকাংশটাই থাকে দৃষ্টির আড়ালে, যাঁরা শেষ পর্যন্ত নামতে পারেন না, তাঁদের সবাই এই প্রথম ধাপ অবধি নেমেই এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করার চেষ্টা করেন।

এবার একটু স্বাদ বদলের পালা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে বেরিয়ে তাই এবার ‘ছৌ’ নাচের আঁতড় ঘর ‘চড়িদা’ গ্রামের দিকে পা বাড়লাম। বাঘমুণ্ডি শহর থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বে অযোধ্যা পাহাড়ের কোলে এই গ্রামটি অবস্থিত। গ্রামের অধিবাসীদের মূল জীবিকা ছৌ নাচের মুখোশ তৈরি করা। কয়েক প্রজন্ম ধরে এঁরা এই কাজই করে আসছেন। কি অসাধারণ নিপুণ এঁদের হাতের কাজ...। মালাভূমির আট থেকে আশি শিল্পীদের হাতের ছোঁয়ায় প্রাণ পাচ্ছে নানান দেবদেবী, গৌতম বুদ্ধের মুখোশ, নানান সিন-সিনারি ইত্যাদি। ছোটো ছোটো মাটির বাড়িগুলোকে কি সুন্দর করে সাজানো যেতে পারে, এই গ্রামে না এলে সেটা অজানাই থেকে যেতো! মনে আছে, বেশ কিছু মুখোশ আমরা সংগ্রহ করেছিলাম স্মৃতি স্বরূপ।

এরপর আমরা দুপুরের খাবার খেয়ে নিয়ে ফেরবার পথে প্রথমেই গেলাম ‘পাখি পাহাড়ে’। শিল্পী চিত্ত দে এখানে পাহাড়ের গায়ে রক কাট শিল্পের মাধ্যমে পাখির ছবি ঐক্যে যে অসাধারণ নিদর্শন তুলে ধরেছেন, তা চাক্ষুষ করতে প্রতিদিন বহু পর্যটক এখানে ভিড় করেন।

আবার শুরু করলাম পাহাড়ে চড়া এবং এসে পৌঁছোলাম লোয়ার ড্যামে। চারিদিক সবুজ পাহাড়ে ঘিরে থাকা লোয়ার ড্যাম, নীচে লহরিয়া ড্যাম এবং দু পাশে সবুজ চাষ চোখের আরামের জন্য উপযুক্ত একেবারে। আমাদের এই ঘোরার সময়টায় খুব একটা সূর্যের দেখা পাইনি আমরা, বরং বদলে বেশ ঝোড়ো আবহাওয়াই ছিল। এরপর এসে

পৌছোলাম আপার ড্যামে। এই ঝোড়ো আবহাওয়ায় জোরে ড্যামের উপর দাঁড়িয়ে থাকা দায়! সূর্যালোকিত দিনে আপার ড্যামের মায়াবী রূপ না দেখতে পেলেও সেদিনের সেই অভিজ্ঞতা ভোলার নয় একেবারেই।

রিসটে ফিরতে না ফিরতেই সন্ধ্যা থেকে শুরু হলো প্রবল শিলাবৃষ্টি, আর আমরা তখন খাটের উপর জমিয়ে বসেছি মোমো, চা আর ভূতের গল্পের থালা সাজিয়ে। বলাই বাহুল্য, এই মোমো, ভূতের গল্প, শিলা বৃষ্টি আর তার সাথে মাঝে মাঝে শোঁ শোঁ হাওয়ার কন্ঠে প্যাকটা কিন্তু বেশ মনে রাখার মতো ছিল!



বামনী ফলস

আর একটা দারুন অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমাদের, তাঁবুতে থাকা। ছোট থেকেই আমার এই তাঁবু ব্যাপারটা নিয়ে বেশ কৌতূহল ছিল, বিভিন্ন বইতে বা টেলিভিশনে দেখতাম, পর্বতারোহীরা তাঁবু খাটিয়ে থাকেন। পুরুলিয়া আমার সেই কৌতূহলটাও মিটিয়ে দিলো। ফেরার আগে সারাদিনটা আমরা ওই রিসটেরই তাঁবুতে কাটিয়েছিলাম।

এবার আমাদের ফেরার পালা... অযোধ্যা থেকে পুরুলিয়া স্টেশনে ফেরবার জার্নিটাও বেশ রোমাঞ্চকর। আমাদের রাতে ট্রেন ছিল, তাই সন্ধ্যার পরই রওনা দিয়েছিলাম, তখনও টুপ টুপ করে হালকা বৃষ্টি পড়ছে। চারপাশে নিকশ কালো অন্ধকার, মাঝে মধ্যে বিডিও অফিস আর দু চারটে গুমটি বাদে কোথাও কোনো আলো চোখে পড়ছে না, দুপাশে দৈত্যের মতো মাথা উঁচু করে সারি সারি গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাঝে সৰু রাস্তা, আর আমাদের গাড়ি ওই ঘন অন্ধকারের চাদর কেটে এগিয়ে চলেছে... মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে সে যেন কোন আদিম যুগে ফিরে গেছি আমরা! পিছনে দাঁড়িয়ে রইল অযোধ্যা- কত যুগের কত না জানা গল্প, কত আদিবাসী সুখ-দুঃখ, হাজার বছরের কত মুগ্ধতা আর গহীন রহস্যকে বুকে চেপে ধরে দৈত্যাকার ছায়ার মত আমাদের দিগন্ত ঐকে দিল।

এই দীর্ঘ পথে ফিরতে ফিরতে বারবার মনে হচ্ছিল, এরকম আরো কত পথ চলা এখনও বাকি পড়ে রয়েছে! বাকি রয়েছে কত অজানাকে জানার আর এই বিপুল অবাক

সৃষ্টিকে চোখ মেলে দেখবার, বোঝবার... সময় তো বড়োই অল্প, তাই নিজেই এই ‘আদিম রতের’ কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম।

*‘I have promises to keep  
And miles to go before I sleep...’<sup>2</sup>*

অবশেষে পুরুলিয়া স্টেশনে এসে পৌছলাম। সময়ের অভাবে বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান আমাদের দেখা হয়ে উঠলো না। যেমন তুরগা ড্যাম, ময়ূর পাহাড়, বরন্তী...কিন্তু তাতে কি!



“And miles to go before I sleep...”

আনন্দটাই তো আসল কথা... সেটা আমরা ওই ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা করে নিয়েছি।

পুরুলিয়াবাসীদের থেকে সব থেকে বড়ো শেখার বিষয় বোধহয় এটাই। অযোধ্যা পাহাড়ের কোলে বেশ কিছু প্রত্যন্ত গ্রামের মধ্যে যাওয়ার পথে দেখতে পেলাম সেখানে মানুষরা কত কষ্ট করে, প্রতিকূলতার মধ্যে দিন কাটায়, অভাব আছে তাঁদের, কিন্তু কোনো অভিযোগ নেই। ছোট ছোট টালির ঘর, তার দরজায় আর দেওয়ালে হাতে আঁকা অপেক্ষক আলপনা, সামনে এক চিলতে ছোট্ট উঠোন, সেটাও ছোট খাটো সবজি, ফুল ফলের গাছ দিয়ে সাজানো। অভাবের সংসারকে নিজেদের সাধ্যমত কি সুন্দর করে সাজিয়ে তুলেছেন এনারা...। দেখলে সত্যিই মুগ্ধ হতে হয়!

এই মুগ্ধতা আর একটা স্নিগ্ধ ভালো লাগা নিয়ে পরের দিন ট্রেনে চেপে বসলাম। ট্রেন ও ছেড়ে দিলো। ট্রেনের হুইসেলের শব্দের সাথে সাথে মিলিয়ে যেতে লাগলো পুরুলিয়া... স্পষ্ট যেন দেখতে পেলাম একতারা হাতে দূর থেকে দূর ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে এক বাউল বুড়ো আর আমি মনে মনে আওড়াছি...

*‘রাঙা মাটির পথের মুড়োয়’*

*কে ওই নাচে, বাউল বুড়ো?*

*মন রে আমার চলো আগডুম*

*এক তারাটায় লাগবুম লাগবুম...!’<sup>3</sup>*

<sup>2</sup>Stopping by Woods on a Snowy Evening / Robert Frost.

<sup>3</sup>চাকা গড়গড় // সরল দে।

## তাজপুর - মন্দারমণি ভ্রমণ

অনুলেখা দে

S. N. Bose Centre এ PhD করাকালীন, প্রফেসর অঞ্জন বর্মনের ল্যাব থেকে আমরা সবাই মিলে ২০১৯ সালে একবার মন্দারমণি-তাজপুর বেড়াতে গিয়েছিলাম। আজ সেই বেড়ানোরই স্মৃতিচারণ করব।

সবাই মিলে হইহই করে মন্দারমণি-তাজপুর বেড়াতে যাব — সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু *Ace* যাবে সঙ্গে। শুনেই বেশ দমে গেলাম। *Ace* হল স্যারের পোষা কুকুর, খুবই কিউট সে - পুচকে, মিষ্টি, কুকুরটিকে নিয়ে আমার ভয়ের অন্ত নেই। অবশেষে যাওয়ার দুদিন আগে জানা গেল, *Ace* যাবে না বেড়াতে। শুনে আনন্দ আর দুঃখ — দুটোই হল।

যাইহোক, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ — তারিখ সকালবেলা আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সবশুদ্ধ আমরা মোট ২২ জন। Centre কে বিদায় জানিয়ে আমাদের ট্রাভেলার ছাড়ল সকাল ৯টায়। প্রথমে নিউ টাউন থেকে স্যার আর ম্যাডামকে নিয়ে আমরা রওনা দিলাম তাজপুরের উদ্দেশ্যে।

কলকাতা ছেড়ে কোনা এক্সপ্রেস ওয়ে ধরে আমাদের ট্রাভেলার এগিয়ে চলল তাজপুরের পথে। কিছুদূর গিয়েই জমে উঠল dumb charades খেলা। স্যারও আমাদের সঙ্গে মেতে উঠলেন সেই খেলায়। স্যার বললেন যে উনি আগে কখনও এই খেলা খেলেননি। তবুও উনি এত তাড়াতাড়ি সব সিনেমার নাম বলে দিচ্ছিলেন আর এত ভালো বোঝাচ্ছিলেন, যে আমরা তো অবাক। দেখতে দেখতে কোলাঘাট পেরিয়ে গেল। সেই সকালে ব্রেকফাস্ট করে বেড়িয়েছিলাম। এতক্ষণে সবারই পেট চুঁইচুঁই। রাস্তার ধারে একটা রেস্টুরেন্টে দাঁড়ানো হল কিছু খাওয়ার জন্য। চটপট অর্ডার দেওয়া হল কোল্ড ড্রিংক্স, ধোসা, পকোড়া, কাবাব, কফি — যার যা ইচ্ছে। খাবার-দাবার উদরস্ত করে, এক রাউন্ড ফটো সেশান সেরে আমরা আবার গিয়ে উঠলাম ট্রাভেলারে।

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম তাজপুর। আমাদের বুক করা হোটেলের কাছাকাছি এসে আমরা দেখি যে গত কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টিতে সেখানে রাস্তা বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আশেপাশের পুকুর - ডোবার জল উপচে রাস্তায় চলে এসেছে। যেটুকু মাটি দেখা যাচ্ছে তাও কাদামাখা আর খুব পিচ্ছিল। ট্রাভেলার হোটেলের সামনে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে এমন হেলে দুলে উঠল, যে

মনে হল এম্ফুনি সবসুদ্ধ নিয়ে গেল বুঝি উল্টে!! যাইহোক, হোটেল থেকে একটু দূরে ট্রাভেলার দাঁড় করিয়ে, বাকিটুকু রাস্তা হেঁটে হোটেল পর্যন্ত, আমাদের খুব সাবধানে কাদামাখা রাস্তা দিয়ে দুপাশের ডোবা বাঁচিয়ে খুব আস্তে আস্তে যেতে হল।

হোটেলটা খারাপ নয়। ছোট ছোট কটেজ টাইপের রুমগুলো হোটেল কম্পাউন্ডের চারিদিক ঘিরে, আর মাঝখানটায় দোলনা, টেঁকি ইত্যাদি নানারকম খেলার উপকরণ। আমরা তাড়াতাড়ি একটু ফ্রেশ হয়ে, লাঞ্চ করে বীচে যাব ঠিক হল। হোটেল থেকে সী বীচ বেশ খানিকটা দূরে। সুতরাং, যেতে হল আবার সেই ট্রাভেলারে করে। বীচে গিয়েই দলের বেশীরভাগ লোকজন হুজোর করে নেমে গেল জলে, সঙ্গে আবার একটা ফুটবল — জলে নেমে খেলার জন্য।

বড় ঢেউ এলে সবাই একসাথে লাফিয়ে ওঠে, আবার কখনও ঢেউয়ের ধাক্কায় উল্টে পরে। সেইসঙ্গে পুরোদমে চলতে লাগলো ফুটবলটাকে হ্যান্ডবল বানিয়ে লোফালুফি খেলা। ব্যতিক্রম শুধু আমি আর পায়েল — বেশি জলে ভয় পাই বলে আমরা দুজন ওদের সাথে অতদূর যাইনি। আমরা থাকলাম হাঁটুজলে — একটার পর একটা ক্লাস্তিহীন ঢেউ নাচতে নাচতে এসে আছড়ে পড়তে লাগলো আমাদের পায়ের ওপর। ম্যাডাম বীচে বসলেন — পরে নামবেন।

তাজপুরের বীচ টুকটুকে লাল কাঁকড়ায় ভরা। তারা সব মনের সুখে বালিতে গর্ত খুঁড়ে লুকোচুরি খেলছে। তাদের ফটো তোলা খুব মুশকিল — কাছাকাছি গেলেই ব্যাটারা পায়ের শব্দে টুক করে গর্তে লুকিয়ে পরে। এই কাঁকড়াগুলোর জন্য তাজপুরের সী বীচকে দূর থেকে খুব রঙীন দেখায়। যাইহোক, পায়েল অতি কষ্টে একটার ফটো তুলল। খানিকক্ষণ পরে প্রতাপ এসে আমায় হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল বেশি জলে, যেখানে সবাই ছিল। প্রথমে একটু ভয় লাগছিল, কিন্তু তারপর যখন ভয় কেটে গেল, তখন কী মজা!! আমি এর আগে কখনও এত বেশি জলে নামিনি। আমি নির্দিষ্ট বসতে পারি সেদিন সবার সাথে সমুদ্রের অতটা জলে গিয়ে লাফালাফি করা আমার জীবনের



সবথেকে সুন্দর অভিজ্ঞতাগুলোর একটা। প্রচুর ফটো তুলে আমাদের এই উল্লাসের মুহূর্তগুলোকে বন্দি করা হল ক্যামেরায়।

প্রায় সন্ধ্যে পর্যন্ত সমুদ্রের জলে লাফালাফি করে আমরা বীচের ধারের একটা অস্থায়ী ঝুপড়িতে বসে চা-টা খেয়ে হোটেলে ফিরলাম। সন্ধ্যাবেলায় হোটেলের দোলনা, টেঁকি - এগুলোতে চাপা, আড্ডা চলল বেশ কিছুক্ষণ। হঠাৎ একবার দেখি টেঁকিতে একদিকে শ্রেয়া আর পায়েল একসঙ্গে চেপেছে, আর অন্যদিকে শুভম একা চেপে ওদের দুজনকে একবারে উপরে তুলে দিয়ে আর নামাচ্ছে না, আর ওরা দুজন ভয়ে অস্থির, চোঁচিয়ে বলছে “আমাদের নামা... আমাদের নামা...” সেই মজা!! দেখে আমরা তো হেসেই কুটিপাটি। রাতে তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে নিয়ে আমরা শুতে গেলাম। খাবার খুব একটা ভালো না হলেও, চলনসই। পাশাপাশি দুটো ডবল বেড রুমে আমরা ৬ জন মেয়ে ভাগাভাগি করে থাকব ঠিক হয়েছিল। একটায় থাকলাম আমি, অরুন্ধতী আর সোমা আর অন্যটায় সুচেতা, পায়েল আর শ্রেয়া। কাল খুব ভোরে উঠে সূর্যদয় দেখে এসে ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা মন্দারমণি যাব।

কিন্তু ভোরে আমি ঘুম থেকে উঠতে পারিনি। গ্ৰুপের যারা উঠতে পেরেছিল, তারা গিয়ে মজা করে সূর্যদয় দেখে এসেছে। রাত্রিবেলায় প্রতাপদের ঘরে একটা বড়সড় ব্যাণ্ডের উৎপাত আর সকালবেলায় হোটেলের ম্যানেজারের ‘সৌরভ কাঁঠাল কে ‘সৌরভ কাস্তুল’ বলে ডাকা ছাড়া আর বিশেষ কোনও মজার ঘটনা ঘটেনি। যাইহোক, আমরা সবাই ব্রেকফাস্ট সেরে রওনা দিলাম মন্দারমণির উদ্দেশ্যে।

মন ভরে গেল মন্দারমণিতে আমাদের বুক করা হোটেল “দিগন্তে”তে পৌঁছে। বিশাল বড় কম্পাউন্ড জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছবির মত ছোট ছোট কটেজ, মাঝে বিরাট লেক, সামনে ঝাউবন, আর সারি সারি ঝাউগাছ গুলোতে টাঙানো দোলনা, আর সামনেই হোটেলের নিজস্ব সী বীচ — সব মিলিয়ে জবরদস্ত। চটপট দিয়ে দেওয়া হল লাঞ্চ-এর অর্ডার। লাঞ্চ করে আবার নামব সমুদ্রে। খাবার রেডি হতে হতে সবাই কিছুক্ষণ দোল খাওয়া হল। একপাল রাজহাঁস (বোধহয় পোষা) দেখি কোথেকে প্যাঁক প্যাঁক করে এসে হেলে দুলে নেমে গেল লেকের জলে। দোলনাগুলোর কাছেই একটা টোটো দাঁড় করানো ছিল — তাতে না আছে যাত্রী, আর না আছে চালক। আমরাই কেউ যাত্রী, কেউ চালক সেজে সেই দাঁড় করানো টোটোতে চেপে খানিক মজা করলাম।

লাঞ্চে পর আবার সমুদ্রে স্নান - লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি আর ছটোপুটির যেন আর অন্ত নেই। তারপর শুরু হল বীচে ফুটবল খেলা। হোটেলের নিজস্ব বীচ, তাই বাইরের ট্যুরিস্টদের কোনও ভীড় নেই। আমরাও যোগ দিলাম সেই ফুটবল খেলায় (যদিও, প্রায় একবারও বল পায়ে ঠেকাতেই পারিনি)।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা। সন্ধ্যাবেলায় নির্জন ঝাউবনের নিস্তন্ধ পরিবেশে বসে জ্যোৎস্নার নরম আলোয় সমুদ্রের জোয়ার দেখার অভিজ্ঞতা সত্যি অবর্ণনীয়। কেমন যেন নেশা লেগে যায়। সমুদ্রের তখন রূপই আলাদা। সে তখন উত্তাল — কোনও এক অজানা রাগে ফুলে ফুলে উঠছে সে — বিরাট বিরাট ঢেউ গর্জন করে আছড়ে পড়ছে বীচের উপর। দুপুরেও যেসব জায়গা দিয়ে হেঁটেছি, সেই সব জায়গা আস্তে আস্তে তলিয়ে যাচ্ছে জলের তলায়। পূর্ণিমার রাতে মন্দারমণির সমুদ্র সৈকত তার সৌন্দর্য এবং চৌম্বকীয় শক্তি দিয়ে তৈরি করেছিল এক অপার্থিব আবহ। সেই মায়াবী পরিবেশে সুচেতা আর সমীরণ নস্টালজিক হয়ে শোনাল তাদের PhD জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা। সেদিন ঝাউবনে বসে চাঁদের আলোয় চকচকে সমুদ্রকে দুচোখ ভরে দেখা আর তার গর্জনকে হৃদয়ের সুরে বেঁধে নেওয়ার মধ্য দিয়ে পেয়েছিলাম এক স্বর্গীয় অনুভূতি।

পরের দিন ভোরে উঠে ঝাউবনের পাখিদের কিচিরমিচির শব্দের মধ্য দিয়ে গেলাম বীচে — আজ আর সূর্যদয়টা কোনওমতেই মিস করা যাবে না। আজও দলের অনেকেই আসেনি, তারা ঘুমাচ্ছে। প্রায় দিগন্তের গেট পর্যন্ত ভিজে বালি দেখে বুঝলাম গতকাল রাতে পূর্ণিমায় জোয়ারের জল উঠেছিল — কিছুক্ষণ আগেই ভাটা শুরু হওয়ায় নামতে শুরু করেছে। যতদূর চোখ যায়, ঠিক যেখানটায় জল আর আকাশ একসঙ্গে মিশেছে, সেখানটায় অন্ধকার সরিয়ে প্রথম সূর্যমামা উঠবেন। কিন্তু আকাশ অল্প মেঘলা ছিল বলে সূর্যদয়টা তেমন জমল না — দেখা গেল না সূর্যমামার রক্তজবার মতো রূপ।

কিছুক্ষণ বীচে ঘোরাঘুরি করছিলাম — দেখি কয়েকজন মাঝি সমুদ্রে মাছ ধরে ফিরছে। বোধহয় গতকাল সন্ধ্যায় গেছিল সমুদ্রে মাছ ধরতে, সারারাত মাছ ধরে ফিরছে। গেলাম মাছ দেখতে। নানারকমের সামুদ্রিক মাছ। বন্ধুরা মিলে কিনে ফেললাম মাছ — আজ সমুদ্রের টাটকা মাছভাজা খাব। অনেকদিন আগে বাবা-মায়ের সঙ্গে পুরী বেড়াতে গেছিলাম — তখন বাবা ভোরবেলায় সমুদ্রের টাটকা মাছ কিনে নিয়ে আসত — অপূর্ব স্বাদ সেই মাছভাজার, এখনও ভুলিনি। মাছ কিনে সুচেতাদের রুমে

গিয়ে সেই সব মাছ পরিস্কার করে আবার যাওয়া হল বীচের ধারের অস্থায়ী বুপড়িতে — মাছগুলো ভাজানোর জন্য। সবাইকে মেসেজ করে জানানো হল যে মাছভাজা হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে দেখি স্যার আর ম্যাডাম আসছেন। দলের আরও দু-একজন এল। একটু পরেই রেডি হয়ে গেল গরম গরম মাছভাজা — অনবদ্য স্বাদ। প্লেটে পরতে না পরতেই উধাও। সমুদ্র দেখতে দেখতে বেশ কিছুটা মাছভাজা খেয়ে, বাকিটা ভাজতে দিয়ে আমরা হোটেলে ফিরলাম। ঠিক হল বাকি মাছভাজা দুপুরে খাওয়া হবে আর দলের যারা খায়নি তাদের জন্য থাকবে।

দুপুরে লাঞ্চ করে আমরা ফিরব কলকাতায়। ফেরার আগে সবাই মিলে এক রাউন্ড গ্রুপ ফটো তোলা হল। ফেরার পথে প্রতাপের শরীরটা একটু খারাপ হল। একে

দলের একজন অসুস্থ, তার ওপর কোনো এক্সপ্রেসওয়েতে সন্ধ্যাবেলায় ট্রাকের জ্যামে ট্রাভেলার এগোতেই পারে না — দীর্ঘক্ষণ বিচ্ছিরি জ্যামে আটকে থেকে সবাই বিরক্ত। অবশেষে দক্ষিণেশ্বরের কাছে এসে রাস্তার জ্যামটা কাটল — আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। Centre পৌছতে বেশ রাত হল।

ঝড়ের গতিতে কিভাবে যে দুটো দিন কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। সবাই মিলে হইচই করে মন ফুরফুরে। মন্দারমণি বা তাজপুর — কোনও জায়গাতেই দীঘার মত ভীড় নেই। আর সেইজন্যই মজা আরও বেশি।

আবার কাল থেকে ল্যাব — মনে অমলিন হয়ে থেকে যাবে এই দুটো দিনের স্মৃতি।



তাজপুর বীচে আমরা সবাই



## ADVENTURES IN KABINI : A ROLLERCOASTER JOURNEY OF SURPRISES AND LAUGHTER

Tuhin Kumar Maji

The life of a research scholar is no walk in the park. Weekends usually get occupied by academic pursuits, leaving little time for recreational activities. But once in a while, fate smiles at us and provides us with an unexpected opportunity. This was the case when we found out our supervisor would be away for the weekend. Without further ado, we decided to take a surprise journey to the enthralling Kabini forest.

Kabini, located about 200 kilometres from Bangalore, has its own distinct beauty. The stunning backwater of the Kabini River, which provides a touch of peace to the vivid forest, is its main appeal. We booked our stay at the lovely Kabini Kaanana guesthouse, noted for its stunning views of the backwater, in a frenzy of enthusiasm. Imagine waking up with serene seas on one side and beautiful jungle on the other.

Our journey began at 5 a.m., when we departed from IISc Bangalore. We had no idea that the first dose of humour would be waiting for us at Yesvantpur railway station. As luck would have it, the train we had reserved, the Humpi Express, was scheduled to arrive at platform number one. However, fate had other intentions, and the train came right under our noses on platform number 2. Alas, we missed the train and were greeted by a comical twist to start our trip. Haha! Undaunted, we waited another 2.5 hours before getting a random train to Mysuru, which

arrived at 11.30 p.m. We were already 2.5 hours behind schedule, forcing us to abandon our dreams of indulging in Mysore Paak, a renowned local sweet.

Determined to make the most of our adventure, we promptly hired a car and embarked on the 60-kilometer journey from Mysuru to Kabini. Anticipating a smooth ride, we soon discovered that even Elon Musk's Tesla would struggle to navigate the chaotic Indian roads. The traffic was insane, and the auto-rickshaw drivers seemed to think they ruled the road. Despite the difficulties, we continued carefully. However, in a peculiar twist, an auto-rickshaw driver parked his vehicle in an oblique manner, resembling Sanath Jayasuriya's batting stance.

Our car brushed up against the auto, triggering a series of events that led us to assume World War II was about to break out!

The auto-rickshaw driver chased us down and brought us to a halt. With animated gestures and a flurry of words in his local language, he unleashed a barrage of complaints. Unfazed by the language barrier, I patiently waited for the moment when he would demand money. He finally asked for compensation after a long rant of curses (which I couldn't understand but secretly found humorous). I passed him the money, and we were back on our way. That was the second hiccup in our voyage, after the missed train. Finally, we arrived at our lovely Kabini Kaanana cottage, and the real adventure began!



*The Humpy Express, which we missed at the start of our journey*



*The areal view of the backwater in the middle of nature*

The homestay, which was located along the banks of the Kabini backwater, provided a panoramic view of the river and the surrounding forest. All the exhaustion of our travel melted away the moment we stepped inside. We were welcomed with a fantastic lunch of chicken curry and a variety of delectable dishes. The symphony of chirping birds in the background caught our attention, adding a touch of magic to our meal. Dining in the company of squirrels and birds was a refreshing contrast from the urban fine dining experiences we were used to.

Eager to explore the backwater, we wasted no time and made our way to the riverbank. The temperature dropped noticeably, accompanied by a cool air whispering through the trees. We made our way to the serene river bank, where we put up our speaker and indulged in blissful relaxation. Nature's soothing noises engulfed us as we relaxed at the water's side, immersing ourselves in the tranquil ambience.

The inviting sight of the crystal-clear water tempted us to take an impromptu swim, despite the lingering fear of crocodiles. We couldn't resist the allure of the safe bathing spot, and for over an hour, we lost ourselves in the mesmerizing waves of the Kabini backwater. The strong wind added to the sensation, evoking the feeling of being in the midst of a vast sea within the Kabini jungle. Reluctantly, we emerged from the water, only to be greeted by the homestay staff, who surprised us with snacks and tea by the riverbank. Ahh, the bliss of sipping hot tea in the lap of the Kabini River, with a cool breeze enveloping us, while the distant call of peacocks serenaded our ears.



*What more could you desire in life than music in the midst of nature and a river?*

We finally returned to the resort after our tea party. Evening sets quickly in the forest, accompanied by a symphony of sounds that electrify the atmosphere. As if to top off the surprises, our homestay arranged a barbecue experience for us. Only the background songs of birds and other creatures provided a melodic

soundtrack to our chat as the jungle was covered in darkness. The atmosphere was exhilarating, and the sensation of sitting by the roaring fire, discussing life outside the boundaries of dull science that filled our days at IISc, was unforgettable. It's hard to put into words the overwhelming sensation that engulfed us, surrounded by the pitch-black jungle, with nothing but the flickering flames for light and the silence that we rarely encounter in Bangalore. Time flew by unnoticed, and before we knew it, the clock struck midnight, signaling the end of five long hours spent in the jungle, reveling in the bliss of the barbecue.



*The Bonfire night in the heart of jungle with pin-drop silence*

With the night drawing to a close, it was time to retire for some much-needed rest. We had an early morning jungle safari awaiting us on the following day. Little did we know that our adventure had only just begun.

## **Day 2 : Thrills and Wonders in the Kabini Wildlife Reserve**

Kabini, a renowned wildlife reserve near Mysore, was the destination for our second day of adventure. With its rich history as the hunting grounds of the Royal family of Mysuru, the forest holds tales of majestic elephants and ferocious tigers. The protected Tiger reserve and the Rajiv Gandhi National park, along with neighbouring national parks, form the largest protected area in Southern India, totaling over 2,000 square kilometers.

Having pre-booked the jungle safari for 6:30 am, we knew we had to wake up early. Unfortunately, our previous day's misadventures made us apprehensive about missing the safari.



Hurrying against the clock, we raced to the Kakana Kote Safari Centre, anticipating a thrilling day ahead.

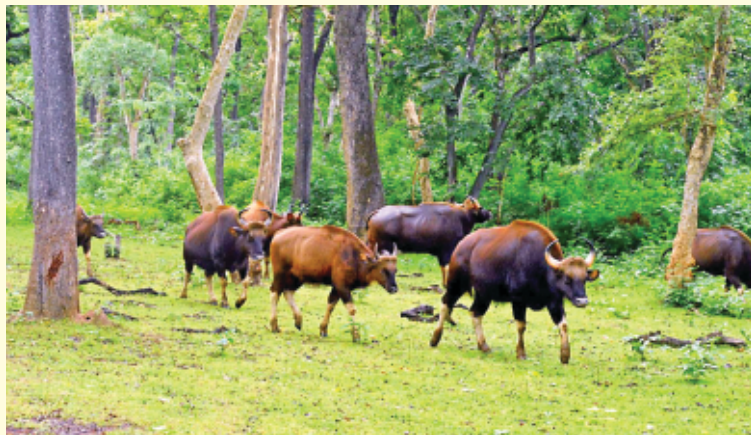
The safari started off with a bus ride with open windows that put us right in the middle of the forest. With over 250 species of birds, including the endangered oriental white-backed vulture, the Nagarhole forests are recognized for their



*The Kabini Kakana Kote Safari center*

diversified birdlife. the red sand that coated the woodland added a distinct flavour to our adventure, making it both hot and vibrant. Within the lush greenery of Kabini's forest, we traversed a muddy broken road, weaving through the vibrant foliage and towering trees. The contrast between the fiery hues of the road and the surrounding verdant landscape created a striking visual spectacle. It was a reminder that even amidst the beauty of nature, there are traces of imperfection and obstacles to overcome. Nevertheless, the allure of Kabini's green paradise remained unyielding, enticing us at every step.

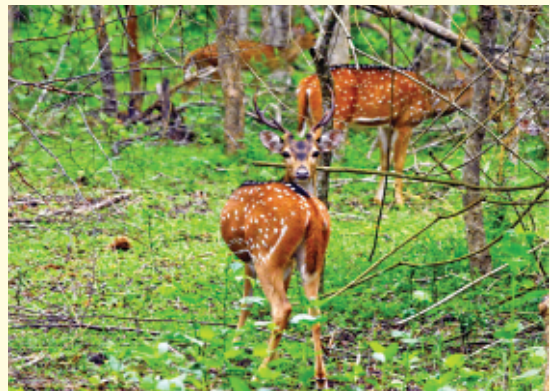
As the safari began, we were greeted by herds of deer engaging in spirited fights, displaying their strength and authority. A troop of wild dogs came across our way, confidently ruling the road. The near contact with these wild animals left us speechless, delivering an up-close encounter with nature's wonders.



*Unexpected encounter with a herd of wild Gaurs*

Soon, a magnificent peacock caught our attention, it took flight, its colorful feathers on full display, presenting a stunning image against the backdrop of the forest.

Just as we marveled at the national bird, a group of majestic Gaurs emerged, playfully blocking our way. Witnessing them sharpening their horns against deadwood added to the authenticity of the wildlife experience.



*Oh Dear, here is the deer.*

As we continued our safari, we reached the riverbank, where a breathtaking sight awaited us. Over 500 deer were distributed along the riverbank of Kabini, creating a stunning sight out of a documentary. This beautiful sight left us in awe.

Feeling content with our safari adventure, we were disheartened that we hadn't caught a glimpse of the elusive "Bagh-Mama" (Tiger). Our disappointment suddenly turned to

exhilaration as our guide quickly whispered, "Sssshhhh, silent, the tiger is coming." The anticipation grew as we searched for the source of the sound. And there it was, a real tiger crossing

the road gently, only 10 meters behind our vehicle. The once-in-a-lifetime opportunity had arrived, and we hastily grabbed our cameras to record the breathtaking scenery. The tiger appeared to pose for us before vanishing into the forest. We had no idea how exciting things were



*A eye soothing view : hundreds of deer wandering along the riverbank.*

about to get. Little did we know that the thrill was far from over.

Driving through the tiger's territory, we experienced the exhilaration of passing through the line of fire. To our astonishment, the tiger reappeared from the bush, presenting fresh possibilities for photographers. Our hearts were filled with delight as we watched the magnificent creature in its natural habitat.

To add to our already overflowing memories, we encountered a family of elephants crossing the road, complete with parents and adorable elephant calves. The trumpeting sound filled the air, adding to the spectacular atmosphere. We also saw a lone

elephant munching happily on grass, utilizing its trunk with grace and power.

Amidst all this, a pack of Dhole (wild dogs) appeared, ready to give us their best poses. We seized the moment and captured some stunning images of these unique creatures. With each passing minute, the safari unfolded new surprises and increased our excitement.

After a thrilling 2.5-hour safari, filled with unforgettable encounters and a myriad of emotions, we returned to our homestay. Returning to our homestay, we indulged in a homemade breakfast of puri-sabji, savoring every bite as we reminisced about our safari adventures. With only a few hours before departure, we decided to visit the mini forest outside the guesthouse. Wandering through the lush greenery, we absorbed the tranquility of the surroundings for the remaining 30 minutes, creating lasting memories.

We returned to the riverbank one last time before saying goodbye to Kabini, savoring the tranquil scenery and reminiscing the wonderful moments we had shared. Reluctantly, we left



*Sudden meeting with a family of elephant crossing the road.*

behind this natural paradise, filled with beautiful memories that would forever hold a special place in our hearts.

As we reluctantly made our way back to Bangalore, the memories of Kabini lingered in our minds, leaving us with a profound sense

of awe and appreciation for the natural world. With a mix of emotions and a renewed appreciation for the natural world, we returned to Bangalore, bringing with us the spirit of Kabini.





*The Tiger appears with his elegance*

The surreal landscapes, the captivating wildlife, and the exhilarating moments of the safari had touched us deeply. And when we returned to the comforts of the city, we knew that the memories



*Beautiful Greenery in the Jungle*



*A Wild dog : Why should the peacock have all the fun when we can also pose ?*

and enchantment of Kabini would continue to inspire us, reminding us of the beauty and importance of our priceless natural heritage. In my thought, the whispers of the drying leaves, the silence of the forest, the chirping of birds, the calmness of River Kabini, thrilling safaris, and the excitement of sighting wildlife, are enough reasons to visit Kabini one more time.

Till then adios.



*The pose master : with a wonderful pose.*



## DISCOVERING THE WORLD, DISCOVERING MYSELF : A SCHOLAR'S TALE

Pratap Kumar Pal

Travel wasn't exactly my thing while growing up. In my family, we didn't have the tradition of exploring new places, and it seemed that the world beyond our immediate surroundings was a distant dream. So, I never quite warmed up to the idea of taking short trips, even when friends suggested we visit local gems like Bandel Church, Sikkim, or even Darjeeling. My dedication to not missing a single school class was unwavering, and I passed up on these opportunities. It's ironic because I was born and



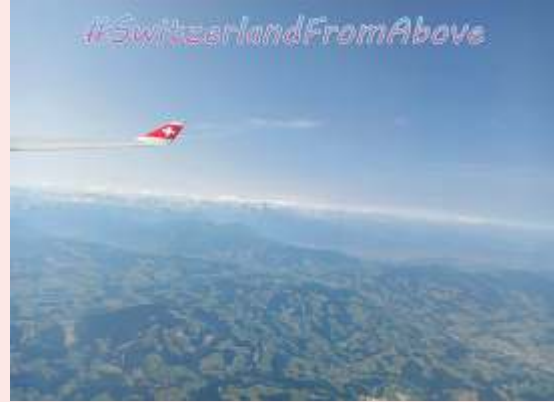
raised in West Bengal, a state that boasts the beautiful Bay of Bengal coastline, with destinations like Digha gracing its shores. Yet, I didn't lay eyes on the sea until I turned 23! My focus was always on my textbooks, and I was, by all accounts, a diligent student. However, when it came to life experiences, I was somewhat lacking. All that changed when I embarked on my PhD journey at S. N. Bose Centre. Life seemed to be chugging along as usual until the fateful day in August 2019, specifically on the 25th. It was then that Sourav da and Santanu da, my senior lab mates, decided to whisk me away from the confines of the laboratory. They had an unscripted plan to visit Bakkhali beach, and, to my surprise, Santanu da had his own car for the trip. I agreed

without much thought. As we neared the beach, the distant sound of the roaring sea reached my ears, and something inside me stirred. Without hesitation, I broke into a sprint towards the source of that mesmerizing sound. It was then that I realized – I had fallen in love with the sea, with beaches, and with the world waiting to be explored. I made a promise to myself. I would discover numerous places, starting with the renowned Goa beach and even some beyond India, all within the duration of my PhD. Goa became a reality in February 2023, thanks to the ICAM-2023 conference and a bit of persuasion with my advisor with a bunch of cool buddies. But before I dive into the Italy trip, dear readers, I intentionally took this detour to set the stage for the adventure that awaited me.

As soon as the email confirming the acceptance of my abstract for the IEEE Magnetics Summer School landed in my inbox (around April if I recall correctly), I felt like a kid on Christmas morning. The sheer excitement of venturing abroad for the very first time, a dream I'd nurtured for so long, had me buzzing with anticipation. The icing on the cake? This adventure was set to be a wallet-friendly one. However, the technical checklist began to grow – visas, accommodations, and all those nittygritty details. The stage was set for the prestigious IEEE Magnetics School 2023, held in the picturesque city of Bari, Italy, from the 11th to the 16th of June. My journey commenced on the 10th of June from Kolkata airport, with plans to reach Brindisi airport in Italy via layovers in Mumbai and Zurich, Switzerland. Now, here's where the adventure truly began. My Air India flight from Kolkata to Mumbai decided to give me an unexpected three-hour delay, effectively shrinking my 4.5-hour layover in Mumbai to a heart-pounding 1.5 hours! Why was this nerve-racking, you ask? Well, I had to switch from Air

India to Swiss Airlines, and I also had to complete the immigration process in Mumbai, as this was my maiden voyage beyond India's borders. The air was thick with tension, and even the Air India crew in Kolkata couldn't provide much reassurance, citing a lack of collaboration between the two airlines. Nevertheless, luck was on my side, and I managed to catch that connecting flight just in the nick of time. Once on the Swiss flight, I made a quick call home to reassure my worried family that I had indeed caught the flight and would likely be out of touch during the journey. The eight-hour journey from Mumbai to Switzerland on Swiss Airlines was nothing short of delightful. The food, ambience, and seat comfort were top-notch, but they couldn't lull me to sleep. I found myself awake throughout the night, observing other passengers in their peaceful slumber. Each seat boasted a screen with real-time flight information – route, altitude, speed, outside temperature, and points of interest. I couldn't take my eyes off that screen and spent the entire night engrossed in it. I touched down in Zurich, Switzerland, a land renowned for its mountains, delectable chocolates, and exquisite timepieces. The airport was a visual treat, and I spent a good five hours exploring every nook and cranny – shops, trains you name it. The tranquil atmosphere of this famous airport had me wandering aimlessly, taking it all in. Just before boarding my flight to Brindisi, I had a chance encounter with a fellow IEEE participant, Priya, an Indian residing in the USA. Our conversation added an enjoyable twist to the layover, and we chatted the hours away. Soon, we were aboard the flight to Brindisi, and after a mere two hours in the air, we landed. What made this landing particularly unforgettable was the proximity of the Brindisi airport to the sea. As the plane descended, it made a breathtaking turn right over the sea's surface, just a few hundred meters above it. The sight of Punta Riso Faro Verde, resembling a fort in the sea, was a jaw-dropping natural wonder that left me spell-bound. It was a visual feast unlike any I had ever witnessed. As we disembarked with Swiss chocolate treats from the flight crew, the bright sun and clear skies greeted us. I had expected warmth, but the pleasantly cool breeze took me by surprise. A bus, now filled with an eclectic mix of people from around the world, whisked us away from Brindisi airport to our destination – the Riva

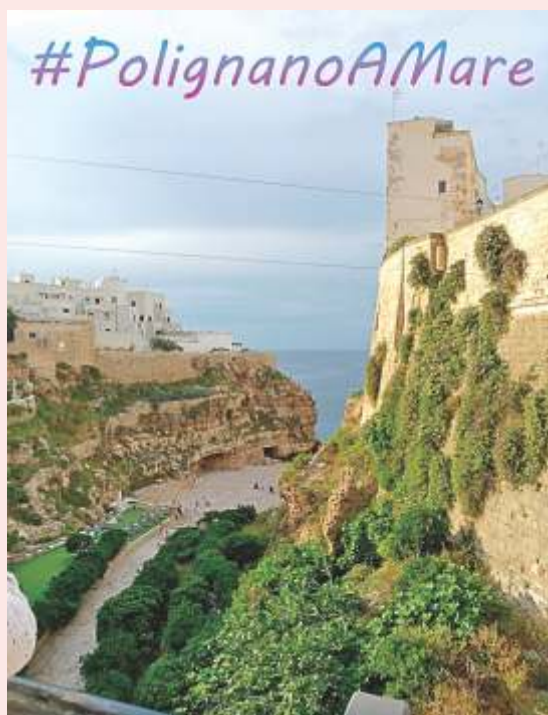
Marina Resort, a four-star haven in Carovigno, southern Italy. The view from the bus window, with lush trees and captivating scenery, left me in awe! As we pulled up to the resort, my already high expectations were exceeded. The place was an absolute gem, adorned with colorful flowers,



inviting swimming pools, charming bars, cozy cafes, and small hotel rooms that seemed to beckon us with timeless allure. It was as if this Italian oasis had been waiting just for us to arrive.

After settling into my room, I wasted no time in refreshing myself and preparing for the very first lecture of the IEEE Magnetics Summer School, Slated to commence at 6 pm local time. This opening session was a light-hearted hour-long affair, focusing on the life of a PhD scholar throughout their five-year tenure. The speaker, a popular figure among IEEE members, took a humorous spin on how scholars view their supervisors over time. In the first year, your supervisor is seen as nothing less than a “God”. By the second year, you realize they’re still learning too. In the third year, you might even question their supervisory skills, and by the fourth year, you’re left wondering if your supervisor knows anything at all! Then comes the fifth year when you think, “Well, maybe they do, but I need those thesis signatures!” Cue the laughter. The talk delved into the role of tea in a scholar's life, work cultures across different countries, and much more. It was a delightful blend of fun, entertainment, and valuable insights, allowing each of us to relate to our unique academic journeys. Following the enlightening talk, a dinner was scheduled, but to my dismay, I couldn't partake. The sight of uncooked fish and vegetables wasn't exactly appealing to my palate, but luckily, there was a wide array of delectable

desserts that managed to sate my hunger for the night. After dinner, we had plans to head to the swimming pool, but the chilly night water kept me at bay. The next three days were a whirlwind of lectures, engaging coffee and lunch breaks followed by poster sessions. The discussions with renowned personalities during these breaks were incredibly enthusiastic and thought-provoking. However, amidst all the academia, we found time to visit the nearest beach, which beckoned us with its deep blue, mesmerizing waters. We ventured onto a private property beach, bending the rules a bit! There, we frolicked in the water, snapped



countless photos, and indulged in endless gossip until dinner called us back. Every dinner was a seafood extravaganza, with an abundance of fish, pork, and beef dishes. The multitude of dessert options left me feeling wonderfully indulgent, and the quality of the juices was top-notch. Interestingly, finding water tap was far more challenging than getting a beer tap! The highlight of the conference had to be the 'Gala dinner' held on the 13th of June. To put it in perspective, Gala Dinners are grand events meant for celebration, reward, or creating memorable experiences, often with a specific dress code. The evening featured professional singers, dancers, and instrumentalists, transforming it into a

mesmerizing spectacle. As they started dancing, one by one, everyone joined in. There we were, dancing alongside professional dancers to lively Italian tunes, and unforgettable sight with around 100 people from across the globe. The food was exceptional, and to my surprise, I found myself not only trying every dish but also developing a newfound love for Italian cuisine within this very short period of time. As we explored the local area around the resort, we were enchanted by the pristine roads, picturesque cars, charming houses, inviting beaches, vibrant flowers, and so much more. These images remained etched in my mind, ready to transport me back whenever I closed my eyes. Fast forward to the 14th of June, the organizers decided to cancel some lectures due to the absence of speakers and instead took us on a trip of Polignano a Mare after the poster session. It was also the day of my poster presentation, so I swapped my casual outfit for something more formal. The plan was simple – we had a ten-minute window after the poster session, and then the bus would depart. That was the plan, at least. However, as I readied myself, my mind was already wandering through the picturesque Italian streets, historic churches, and inviting beaches. We had only a few hours to explore the city, and every corner was a visual masterpiece. On one side, the beautiful sea sparkled, while historic streets beckoned on the other. I was torn, unsure of where to direct my gaze!! The tiny islands dotting the sea and the white boats gently gliding through the deep blue waters added another layer of enchantment. We visited charming churches, explored local shops, and took thousands of photos. I practically begged two or three fellow attendees with iPhones to capture my moments, and they were more than willing, often saying, 'Pratap, pose here, the background is too beautiful!' We even ventured to the beach, and it was, without a doubt, the most beautiful sea beach I had ever laid eyes on. This gem was nestled in Puglia or Apulia, along the Adriatic Sea. Italy, a Mediterranean masterpiece, is celebrated for its diverse regions and breathtaking coastal landscapes. In the southern region of Apulia, the city of Bari serves as a gateway to the Adriatic Sea. As I strolled along Bari's coastal beaches, I was utterly spellbound by the deep blue hues of the Mediterranean Sea merging seamlessly with the pristine waters of the Adriatic. The immaculate cleanliness and the



vibrant colors of the sea created an enchanting experience. It felt like the universe had painted this coastal paradise just for us, and I couldn't help but be profoundly moved by the natural beauty that surrounded me. Our exploration of Bari continued with an authentic Italian pizza stop at 'Al Buco Preferito', one of Bari's renowned pizzerias. The pizza surpassed all expectations, leaving me pondering what we'd been eating back in India – was that even pizza?! With our bellies full of the crispiest, softest, and most mouth-watering pizza in the world, we ventured forth to explore the local shops. The roadside shops held a treasure trove of surprises, from chocolates to home decor and perfumes. One perfume shop, in particular, captivated my attention with its premium appeal and exquisite scents. Unfortunately, the prices were a tad steep for my budget, so I contented myself with admiring from a distance!! Nevertheless, we did stumble upon some more budget-friendly shops where I picked up a charming little bag for my mother and a dashing belt for my father. Now, onto the most thrilling part of the trip – our visit to Politecnico di Bari, the hosting university, and an excursion around the city of Bari. It was the 15th of June, the second-to-last day of the summer school. We were whisked away to visit the university, where nine specially chosen candidates, myself included – the sole representative from India – were scheduled to give talks in front of an excited audience, including members of the university. The campus was a sight to behold, boasting well-decorated classrooms and a vibrant academic atmosphere. After wrapping up our presentations, we ventured into Bari, the city itself. For reference, Bari, Italy, is renowned for its historic old town, home to the Basilica di San Nicola and a maze of picturesque streets. The city is a culinary haven, especially for seafood lovers, and serves as a major Adriatic port connecting Italy to the Mediterranean. Our exploration took us through a labyrinth of narrow winding streets, charming alleyways, and historic structures. Bari's atmosphere was enchanting, marked by its historic architecture and bustling street life. The city's streets were teeming with people, and numerous churches dotted the landscape. We managed to visit two of them, including the famous Basilica di San Nicola. Coincidentally, we were treated to an Italian wedding inside the church – it felt like watching a

scene from a movie. A crowd eagerly awaited the bride and groom with flowers and cameras just outside the church gate, where the couple would exchange their first kiss. I couldn't resist and rushed out of the church to catch a glimpse – it was an astonishing experience, to say the least, and I cherished every moment of it. Our journey continued as we visited notable landmarks like Bari Centrale, the main railway station; Palazzo Mincuzzi, a historic palace once owned by the prominent Bari family of merchants; and Teatro Petruzzelli, the city's grandest theatre and the



fourth-largest in Italy. All of these buildings were beautifully adorned with rich historical significance. We had a blast, and when I say “we”, I’m referring to the six cool buddies – George from Germany, Vaishnavi from Belgium, Priya Shan from the USA, and Manoj, Priyanka and Vismaya from India including myself. Despite our diverse backgrounds, we all bonded as Indians abroad. After a tiring day of exploration, we paused to replenish our energy. We found McDonald's where we savored burgers and then the renowned Italian delicacy, Gelato – Italian ice cream at its finest. Each spoonful of gelato seemed to melt effortlessly in our mouth, a pure gastronomic delight that left an everlasting impression! With these historic masterpieces

etched in our hearts and the taste of gelato lingering on our taste buds, it was time to bid farewell to the city. We made our way back to Riva Marina, and it's worth noting that the sun sets quite late in Italy, around 8 or 8:30 pm. Dinner was typically finished by 7:30 pm, which meant we had our dinner with the sun still shining overhead. It was quite a contrast to the Ayurvedic tradition of finishing dinner before sunset. By the time we reached our destination at around 9 pm, we weren't hungry – our stomachs were full of memories. Moving forward, the last day of the school arrived on the 16th of June. We headed to the morning lectures with heavy hearts after enjoying a lavish breakfast. It's worth noting that the breakfast spread was a feast for the senses – with tables laden with hundreds of options,



including cakes, juices, cappuccinos, pastries, fruits, and more. The choices were endless, and you could indulge to your heart's content. Throughout the day, we attended lectures, engaged in discussions on various topics, and this time I have bombarded the speakers with a barrage of questions. However, the final part of the school awaited us – the prize distribution session and concluding thoughts. They once again announced the winners, and while I was among them, it didn't bring a smile to my face. Instead, I felt a profound sense of sadness as we were on the brink of bidding farewell to this extraordinary experience. Professor Vito Puliafito's closing remarks moved us to tears. His emotional speech was filled with invaluable insights, including statistics about the participants from different parts of the world and how fortunate we were to be selected for the school, all funded by IEEE. Some participants, including a few eminent speakers, hadn't even

received their visas on time! As of September 19th, they still hadn't reimbursed us, but that didn't dampen our spirits. We bid farewell to almost everyone, handing over beautifully written short notes to Prof. Vito as a token of our appreciation for making it all happen. That night, after dinner, we all danced together to different Italian songs. We mimicked the steps alongside professional dancers, and the festivities went on until late night. It was heartwarming to see professors, organizers, and scholars all dancing together like crazy. The next day, my scheduled flight was at 8:20 pm from Brindisi. After checking out of my room, I spent the entire day waiting at the reception. There, I had the pleasure of meeting Prof. Sara Majetich from the USA, a well-known professor in our field. We spent the entire day discussing various aspects of academia, industry, presentation skills, communication skills, and many more. It was an incredibly valuable 6 to 8 hours spent talking to her, learning from her, receiving feedback on my presentations, and gaining insights even from what I considered a subpar talk. Thanks to Sara, I left with a deeper understanding of various aspects of our field and even beyond that. As the hours passed, and boredom set in from sitting around for so long, we decided to take a colorful toy train to a nearby beach. It was a lovely way to spend some time by the beautiful beaches one last time, all while engaging in constant chit-chat.

As my journey drew to a close, I left Brindisi, Italy, for Zurich, Switzerland. Unfortunately, the flight was delayed by over an hour, so I reached Zurich around 11:30 pm, nearly an hour behind schedule. This left me with a layover of approximately 12 hours in Zurich before my next flight, scheduled for 9:55 am the next day. I had a pre-planned visit to Switzerland and was headed to Sourav da's residence in Brugg, which was about a 1.5-hour train ride from Zurich Airport. Sourav da had thoughtfully sent me train tickets in advance. I was slightly nervous about catching the train as my internet wasn't working, and my schedule had been delayed due to the flight. I was also concerned about making it back well before my next flight the next day. In the train, I managed to convince a fellow passenger to share his hotspot with me so that I could message Sourav da. Convincing him was quite an achievement, as he didn't understand English, and I couldn't



comprehend German or Swiss German. Still, I managed to convey my need – a testament to my street-smart skills!!! To my surprise, when I arrived at Brugg station at around 12:30 am, not only Sourav da and Nabanita boudi but also Sushmita di and two more alumni from IACS were there to greet me. They took me to their house, where they served me a delicious meal of rice and Chicken. It was a treat, especially since I hadn't had rice in a while. We chatted about various aspects of school, lab work, and more, particularly with Sourav da. I managed to get a few hours of sleep before waking up at 5:30 am to begin my journey back to India. Boudi prepared tea for me and gave me some fruits and nuts to break my fast from the night before. Sourav da dropped me off at the Brugg station. The trains in Switzerland were incredibly spacious compared to the ones in India, and even though I hadn't slept much the night before, the breathtaking views from the train window kept me wide awake and filled with joy. How could I possibly sleep when I was in one of the most beautiful countries in the world? I observed every detail of the mesmerizing scenery outside the window and cherished every moment of the journey. I reached Zurich before 7:45 am and checked in. It was then that I discovered there were electronic zones where you could generate a code using your boarding pass to connect to the airport's free Wi-Fi. I made a long-awaited phone call to my mother and bought plenty of chocolates from Zurich's duty-free shops. Despite their high prices, I couldn't resist the allure of Swiss chocolate. After making my purchases, I boarded the flight back to Mumbai. An interesting situation arose during the flight. I had deliberately chosen a window seat to enjoy the views of Switzerland. However, a couple who had just finished their honeymoon in this beautiful land wanted to sit together, with me in between them. Despite their multiple requests, I chose to be a bit selfish this time, not giving up my seat. I wanted to soak in the breathtaking beauty of the snow-covered mountains and the solitary roads winding through lush landscapes. The eight-hour flight was comfortable, with timely servings of food, juices, and snacks. This time, in addition to the visual display board I mentioned earlier, I spent some time watching movies and playing games on the personal screen

provided to each passenger. It was a fun and enjoyable journey. Time flew by, and I landed in Mumbai at 9:40 pm, IST. I spent the entire night at the airport, wandering around, sitting in quiet corners, and even taking a late-night trip to Juhu Beach. The next day, I caught an early morning flight at 6 am and finally reached my destination, Kolkata Airport, at 8:45 am on the 19th of June.

Now, as I wrap up this rollercoaster of a journey, I can't help but chuckle at the whirlwind of experiences, emotions, and new found love for exploring that this trip has brought into my life. You see, there was some nervousness, sure, and a dash of excitement as I embarked on this grand adventure – my first journey outside my home country, and to top it all, I was flying solo. But what followed was a delightful concoction of fun, learning, and experiencing different cultures, all washed down with those endless hours of long flights and the notorious jet lag – my not-so-welcome travel companion. But you know what they say, the best stories often come from the unexpected, the unplanned, and the unknown. And boy, did I collect a treasure trove of memories that I'll cherish for the rest of my life! As I pen down these words, I'm not just recounting my adventures; I'm inviting you to step into my shoes, to embark on this journey with me, and to dive headfirst into the world of unknown roads, majestic mountains, pristine beaches, and captivating cultures – all through the power of your imagination. Because, you see, this journey transformed me from that regular boy to an enthusiastic explorer over the course of my PhD tenure. It's proof that sometimes, all it takes is that one trip, that one leap into the unknown, to discover a whole new side of yourself. And now, as I look back at where it all began, I can't help but marvel at the beauty of it all – the transformation, the growth, and the sheer joy of being a part of this incredible world we call our own. So, dear reader, as you join me on this adventure through words and memories, I hope you find a piece of yourself in these tales. I hope you're inspired to take that leap, book that ticket, and explore the uncharted territories of your dreams. Because life is an adventure, and the world is waiting for you to discover it. Just like I did. From a boy who had never seen the sea to an explorer of new horizons – that's my journey, and I hope it's a story that

## ফুলের উপত্যকায় একা

গুরুদাস ঘোষ

দেখতে দেখতে হিমালয় ভ্রমণের প্রায় দুই দশক পার হয়ে গেল। কখনো পর্যটক হিসেবে, কখনো অভিযাত্রী হিসেবে। তবুও, আমার উইশ লিস্ট-এর একটা সুন্দর জায়গা ‘ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স’ অদেখা থেকে গিয়েছিল। আগে যাবার কথা ভাবিনি তা নয়, সময় এবং সুযোগের অভাবে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ট্রেকিং ক্লাবের পক্ষ থেকে যে সব ট্রেকিং এর



ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স

আয়োজন করা হয়, সেগুলো ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্সের মতো ছোটো ট্রেক নয়। আবার পাহাড়-অনভিক্ত সঙ্গী নিয়ে পাহাড়ে যাওয়া আর এক বিড়ম্বনা। সুতরাং একাই যাওয়া ঠিক করলাম।

ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় অবস্থিত। উপত্যকার বিভিন্ন অংশের বিচারে উচ্চতা ১২ হাজার থেকে ১৩ হাজার ফিট। এই উপত্যকার খুব কাছেই রয়েছে শিখ ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র তীর্থস্থান হেমকুণ্ড সাহিব যার উচ্চতা প্রায় ১৫ হাজার ফিট। ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স এবং হেমকুণ্ড সাহিব — দুটি স্থানের নিকটবর্তী এবং একমাত্র থাকার জায়গা হল ঘান্সারিয়া সুতরাং অধিকাংশ যাত্রীই দুটি জায়গাই দেখে নিতে চান এক যাত্রায়। ভ্যালিতে ফুল দেখার আদর্শ সময় জুলাই থেকে আগস্ট। কিন্তু ওই সময় বৃষ্টি একটা বড় সমস্যা।

হরিদ্বার থেকে যে সব তীর্থস্থানে যাওয়া সম্ভব, তার মধ্যে খুব জনপ্রিয় একটি তীর্থস্থান হল বদ্রীনাথ। বদ্রীনাথ যাবার পথে প্রায় ২৬০ কিমি পেরোলে গোবিন্দঘাট, যা বদ্রীনাথ থেকে প্রায় ৩০ কিমি আগে। গোবিন্দঘাট থেকে একদিনের ট্রেক করে যাওয়া যায় ঘান্সারিয়া। উচ্চতা ১০ হাজার ফিট। ঘান্সারিয়া থেকে মাত্র ২ কিমি দূরেই ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স-এর গেট। তবে এই উপত্যকা এতটাই বিস্তীর্ণ, যে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে আবার দিনের আলো থাকতে ফিরে আসা কঠিন। ঘান্সারিয়া থেকে হেমকুণ্ড সাহিবের দূরত্ব ৬ কিমি। দূরত্ব বেশি না হলেও চড়াই খুব বেশি। মাত্র ৬ কিমি পথে ৫ হাজার ফিট উচ্চতা বৃদ্ধি পথের চরিত্র বোঝানোর জন্য যথেষ্ট।

ট্রেনের টিকিট কাটার পরে শুরু হল তল্লিতল্লা গোছানো। চিন্তা ছিল বৃষ্টি নিয়ে। ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্সে ঢোকার পর বৃষ্টি হলে কীভাবে নিজেকে এবং মালপত্র রক্ষা করা যাবে! ওখানে কোনোরকম কৃত্রিম জিনিসের ব্যবহার নিষেধ। কোনো মাথা গাঁজার জায়গাও নেই। একবার ভিজে গেলে সেই ভিজে পোষাকেই থাকতে হবে ঘান্সারিয়া না ফেরা পর্যন্ত। একটা পক্ষে (রেনকোট) কিনলাম যা পিঠের ব্যাগ সমেত ঢাকতে পারবে। হাঁটু পর্যন্ত দীর্ঘ হওয়ার ফলে পায়ের জুতোও খানিকটা রক্ষা পাবে। তবুও জুতো ভিজে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছিল, তাই একটা অতিরিক্ত জুতো নিতে হল।

২০২২ সালের ২৫শে জুন হাওড়া থেকে কুম্ভ এক্সপ্রেসে উঠে বসলাম। জানলার পাশে বসে নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে সময় কাটছে। যাত্রাপথের খুঁটিনাটি কিছু তথ্য দেখে নিচ্ছিলাম। প্যান্ডিকারের খাবারে নৈশভোজ ও পরের দিনের মধ্যাহ্নভোজ সারা হল। পরিকল্পনা ছিল হরিদ্বার পৌঁছে ঐদিনই হাযিকেশ চলে যাব। বদ্রীনাথগামী বাস হরিদ্বার থেকেও পাওয়া যায়, হাযিকেশ থেকেও পাওয়া যায়। তবে হাযিকেশ থেকে ভোরের বাস ধরতে পারলে গোবিন্দঘাট একটু আগে পৌঁছানো যাবে এবং

হোটেল খুঁজে নিতে সুবিধা হবে। ভাগ্যক্রমে ট্রেন বেশি লেট ছিল না, মাত্র দু'ঘণ্টা, যা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

হরিদ্বার স্টেশনে নেমেই চলে এলাম নিকটবর্তী বাসস্ট্যান্ডে। একটি বাস হৃষিকেশ যাচ্ছিল, উঠে বসলাম।



হৃষিকেশ থেকে বদ্রীনাথগামী বাস

ভাড়া নিল ৩০ টাকা। সময় লাগার কথা এক ঘণ্টা, কিন্তু লেবেল ট্রসিং এর কাছে আটকে থাকায় এবং জ্যামের কারণে প্রায় ২ ঘণ্টা লাগল। এখন নিয়মিত বদ্রীনাথ যাত্রা চলছে। বাসের টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে। কালবিলম্ব না করে আগামীকালের বাসের খোঁজ করলাম। ভোরের বাসের টিকিট বিক্রি হচ্ছে। সিট আছে, তবে একেবারে পিছনের দিকে। তাই-ই সই। ভাড়া ৫০০ টাকা। টিকিট কেটে বাসটাও দেখে নিলাম। কলকাতার মিনিবাসের আকারের। তবে সিটগুলো ভালো। বলল, বাস ভোর ৫.৩০-এ ছাড়বে। ৫ টায় চলে আসতে।

৫টার সময় তো ভোরের আলোও ফুটে না। তাই বেশি দূরে হোটেল নেওয়া উচিত হবে না। বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি একটা হোটেলে ঘর নিলাম। ছোটো ঘর। তবে বাথরুম সংলগ্ন। আমি কেয়ারটেকারের ঘরটা দেখে নিলাম। যদি অত সকালে হোটেলের মূল দরজা না খোলে, তাহলে তাকে ডেকে তুলতে হবে। ঘরের মধ্যে রুকস্যাক রেখে একটা ছোটো ব্যাগে জলের বোতল, একটা টর্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য আশপাশটা ঘুরে দেখা এবং একেবারে রাতের খাবার খেয়ে হোটেলে ঢোকা।

কয়েক বছর আগে দেখা হৃষিকেশের অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। লোকজন, হোটেল, দোকান — সবই বেড়েছে। হাঁটতে হাঁটতে জানকী ঝুলা পর্যন্ত গেলাম। অনেক আলো এবং লোকের ভীড়ে মনে হচ্ছিল কোনো মেলাপ্রাঙ্গণ। ঝুলার ওপর থেকে দেখলাম রাতের গঙ্গার রূপ। দূরে গঙ্গার তীর বরাবর কয়েকটি চিতার আগুন

জ্বলছে। অনেকটা হেঁটে এসেছি। এবার ফেরার পালা। মূল রাস্তার ভীড় এড়াতে ভিতরের গলিপথ ধরেছি। গুগল ম্যাপ বেশ ভালো কাজ দিচ্ছে। একটা ধাবায় অনেক লোক খাচ্ছে দেখে আমিও ঢুকে বসলাম। মিক্সড ভেজ আর রুটি দিয়ে রাতের আহার সেরে ফিরে এলাম হোটেলে। ব্যাগের যে সব জিনিসপত্র যাত্রাপথে প্রয়োজন হতে পারে, সেগুলো সামনের দিকে গুছিয়ে রেখে, ফোনে অ্যালার্ম সেট করে শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সঙ্গে সঙ্গেই, তবে অ্যালার্ম বাজার আগেই ঘুম ভেঙে গেল। ভোর ৫ টায় রুকস্যাক পিঠে নিয়ে নিচে নেমে এলাম। কেয়ারটেকার সজাগ ছিল। একবার ডাকতেই দরজা খুলে দিল। বাসস্ট্যান্ড মাত্র ২ মিনিটের পথ। বাসস্ট্যান্ডে এসে দেখি বাসস্ট্যান্ড ততক্ষণে যাত্রী এবং বাসকর্মীদের হাঁক-ডাকে জেগে উঠেছে। আমি যে বাসটায় যাবো সেটার ভিতরের আলোগুলো জ্বলছে। অনেকে উঠেও বসেছে। আমি উঠে বসলাম। বাসে উঠে দেখলাম প্রায় দশজন গেরুয়া



রাস্তা সারাইয়ের জন্য যাত্রাবিরতি

বসনধারী সাধু। সকলেই চলেছে বদ্রীনাথ দর্শনে। আর রয়েছে উত্তরপ্রদেশের একটি গ্রাম থেকে আসা একটি বড় দল। বাস ঠিক সাড়ে পাঁচটায় ছাড়লো। চলার পথে বাসটি কয়েকটি হোটেল এবং গুরুদ্বারের সামনে থামল এবং সেখান থেকে যাত্রী তুলল। বুঝলাম কিছু আসন আগে থেকেই বুক করা ছিল হোটেলের মাধ্যমে। হৃষিকেশ শহর পেরোবার পর গাড়ির গতি একটু বাড়ল, কিন্তু পাহাড়ি পথে দ্রুত যাওয়ার সুযোগও নেই। বিভিন্ন সময় যাত্রীদের খাওয়া এবং টয়লেটের জন্য যাত্রাবিরতি হচ্ছে। কখনো রাস্তা মেরামতের কাজ চলছে তাই অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

এইভাবে দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, পিপলকোটি, যোশিমঠ প্রভৃতি পাহাড়ি জনপদ পেরিয়ে, ২৬০ কিমি পথ অতিক্রম করে গাড়ি যখন গোবিন্দঘাট এসে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হতে বেশি দেরি নেই। পথের পাশেই



সুন্দর এক আধুনিক হোটেল। ভাড়া জানালো ৩৫০০ টাকা। আমার শুধু রাতটুকু কাটানোর প্রয়োজন। চিন্তা করলাম, অনেক পর্যটক যখন গোবিন্দঘাট হয়ে হেমকুণ্ড সাহিব যায়, সেই সঙ্গে গুরুদ্বারে নিখরচায় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও আছে, তখন কম বাজেটের হোটেল অবশ্যই আছে। কিছুটা পিছনের দিকে ফিরে আসছিলাম হোটেলের সন্ধানে, তখনই চোখে পড়ল নীল-সাদা ছোট হেলিকপ্টারের



হ্যালিপ্যাড, গোবিন্দঘাট

ওড়াউড়ি। সেই সঙ্গে রাস্তার ধারে ডেকান এয়ারলাইন্সের অফিস। খোঁজ নিয়ে জানলাম অফিস সংলগ্ন ছোট হ্যালিপ্যাড থেকে সোজা ঘান্সারিয়া যাচ্ছে হ্যালিকপ্টার। ভাড়া জনপ্রতি ২৯৭৫ টাকা। সময় নেবে মাত্র ৫ মিনিট। ভাবলাম, হোটেল খোঁজাখুঁজি না করে সোজা ঘান্সারিয়া পৌঁছে গেলে কেমন হয়! রাতে ঘান্সারিয়াতে থাকবো, আর কাল সকালেই আকাশ্চিত্র গম্ভব্য ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স-এ পৌঁছে যাব। দিনের আলো কমে আসছে। অফিসেও ভিড় নেই। বললাম এখন যদি যেতে চাই, যাওয়া যাবে? দায়িত্বে থাকা ভদ্রলোক বললেন, একটু বসুন। যদি আর চারজন যাত্রী হয়ে যায়, তাহলে যাবে।

ইতিমধ্যে অপেক্ষারত আর পাঁচ যাত্রীকে নিয়ে কপ্টার উড়ে গেল ঘান্সারিয়ার দিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আরো চারজন আগ্রহী যাত্রী পাওয়া গেল এবং জানা গেল হ্যালিকপ্টার আবার আসবে। তাড়াতাড়ি রুকস্যাক থেকে ভারী জ্যাকেটটা পরে নিলাম। গোবিন্দঘাট থেকে ঘান্সারিয়ার তাপমাত্রা নিশ্চয়ই অনেকটা কম হবে। যাত্রীদের মালপত্র হ্যালিপ্যাডের কিছু কর্মী নিয়ে রেডি হয়ে রইল। কপ্টার থামতেই আমরা সিটে উঠলাম আর আমাদের মালপত্র পিছনের দিকে মালপত্রের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় ভরে দিতেই কপ্টার উড়ে চলল পুষ্পবতী নদীর

অববাহিকা বরাবর। দুপাশে পাহাড়ের সারি, নিচে গাছপালার আড়ালে শুভ্র নদী সামনে আকাশ আর জঙ্গল। এই পথে নিত্য যাতায়াত করে পাইলটের দক্ষতা অসীম।



হ্যালিপ্যাড, ঘান্সারিয়া

একটু মজা করার জন্য আচমকা কয়েক মিটার নামিয়ে দিলেন কপ্টারটি। আর যাত্রীরা অ্যামিউজমেন্ট পার্কে ভীতিপ্রদ রাইড চড়ার সময় যেমন ভয় ও উচ্ছ্বাস মিশ্রিত আওয়াজ করে, তেমনটি করে উঠল। দূরে দেখা গেল কিছুটা সমতল ক্ষেত্র এবং তার মাঝে সাদা বৃত্তের মধ্যে 'H' অঙ্কর। বুঝলাম ঘান্সারিয়া এসে গেছি। কপ্টার থেকে নামতেই সকলে ঠাণ্ডায় জড়োসড়ো। ভাগ্যিস ভারী জ্যাকেটটা আগেই পরে নিয়েছিলাম! ডেকান এয়ারলাইন্সের কর্মীরা ব্যাগ নিয়ে এল। রুকস্যাক পিঠে নিয়ে ঘান্সারিয়া অভিমুখে হাঁটতে শুরু করলাম। মিনিট পাঁচেকের চড়াই পথ পেরোতেই নানাবিধ দোকান, ঘোড়ার আস্তাবল এবং যাত্রীদের আনাগোনা দেখে বুঝতে অসুবিধা হল না যে ঘান্সারিয়াতে পৌঁছে গিয়েছি।

পথের বাম দিকেই গাড়োয়াল বিকাশ নিগমের গেস্ট হাউস চোখে পড়ল। অন্য হোটেল বা ধর্মশালায় খোঁজ করার আগে ওখানেই প্রথম গেলাম। কেয়ারটেকার জানাল ডমিটরিতে থাকার ব্যবস্থা হতে পারে। একতলায় পাশাপাশি দুটো ঘরে ডমিটরি সাত-আটটা খাট। প্রতিটাতেই ভালো গদি এবং তিনটি করে লেপ আছে। প্রতি ঘরের সঙ্গে বাথরুম ও টয়লেট রয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলা চলে। ভাড়া মাত্র তিনশো টাকা প্রতিদিন। ভাবলাম, হেলিকপ্টারে এসে ভালোই হয়েছে। আপাতত আগামী তিন রাতের অবস্থান এখানেই। কেয়ারটেকার জানানেন, রাতে খাবার ব্যবস্থা ক্যান্টিন থেকে হয়ে যাবে, তবে আগে জানিয়ে রাখতে হবে। দিল্লী থেকে আগত চার জনের আরো একটি ট্রেকারের দল একই ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। হিমালয় ট্রেকিং নিয়ে কিছুক্ষণ কথা হল। ওরাও ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স

এবং হেমকুণ্ড সাহিব যাবে। মোবাইল টাওয়ার ধরছে না। বাড়িতে ফোন করার জন্য স্থানীয় একটি দোকানে গেলাম। গোবিন্দঘাটে শেষবারের মতো ফোন করে নিজের অবস্থান জানিয়েছিলাম, তার পরে আর যোগাযোগ নেই। বাড়িতে



জি এম ভি এন গেস্ট হাউস, ঘান্সারিয়া

জানালাম আজই ঘান্সারিয়া চলে এসেছি। আবার আগামীকাল রাতে ফোন করবো। ওই দোকান থেকেই একটা শক্ত লাঠি কিনে নিলাম। কাল ট্রেকিং-এ কাজে লাগবে।

রাত বাড়তেই ঠাণ্ডা বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। ঘরে লেপের নিচে ঢুকে ছিলাম বলে বুঝতে পারিনি। আটটা নাগাদ কেয়ারটেকারের ডাকে নৈশভোজের জন্য ক্যান্টিন পর্যন্ত হেঁটে যেতেই ঠাণ্ডার প্রকোপ অনুভব করা গেল। খাবারের বাছল্য কিছু নেই। ভাত, ডাল, রুটি, তরকারি বা আলুভাজা, ডিনার সেরে বিছানায় জোড়া লেপের নিচে ঢুকে পড়লাম। চোখ বন্ধ করলেও ভাসছে আজকের যাত্রাপথের চিত্র। ভাবতে অবাক লাগে, আজ সকালে কোথায় ছিলাম, এখন কোথায় আছি।



ঘান্সারিয়া

সকালে উঠে হাষিকেশ থেকে আনা বিস্কুট আর সন্দেশ খেয়ে সঙ্গে দুপুরের খাবার হিসেবে টিফিন বাক্সে চিড়ে, দুধ এবং চিনি মিশিয়ে রেডি করে নিলাম। প্রসঙ্গতঃ জানাই, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্সে কোনো দোকান নেই, তাই কোনো কিছুই পাওয়া যায় না। এক কাপ চা-ও নয়। রুকসাক গেস্ট হাউসেই রইল। একটা ছোটো ব্যাগে নিলাম খাবার, পঞ্চগ, অতিরিক্ত জুতো, জলের বোতল আর ক্যামেরা। সবশেষে কতকালের কেনা লাঠিটা তুলে নিয়ে পথে নামলাম। একটু এগিয়েই বাম দিকে ঘান্সারিয়া গুরুদ্বার। বহুতল এই গুরুদ্বারে অনেক তীর্থযাত্রী থাকে। রাস্তার দু-পাশে খাবার



পথ গিয়েছে ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্সের দিকে

দোকান কিংবা হোটেল। আর দেখা যায় তেলের বোতল নিয়ে বসে আছে মালিশ করার লোক।

হোটেল, দোকানপাটের শেষে একটা জায়গায় অনেক ঘোড়া ও সহিসের অবস্থান। হেমকুণ্ড দর্শনে অনেকেই ঘোড়া নেয়। ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্সে ঘোড়ার অনুমতি নেই। থাকলেও নিতাম না কারণ নিজের পায়ে হাঁটলে যে স্বাধীনতা থাকে, ঘোড়ার পিঠে তা নেই। আমি ঘোড়ার



হিমবাহ থেকে মুক্তি পাওয়া পুষ্পবতী নদী



পিঠে জীবনে একবার মাত্র উঠেছিলাম অমরনাথ গুহা থেকে শেষনাগ পর্যন্ত পথে ফেরার সময় বৃষ্টি নেমে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে। যদিও রাজু নামের সেই ঘোড়াটি খুবই ভালো ছিল এবং পথ চলতে চলতে সেই ঘোড়ার সঙ্গে সুন্দর বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল। এখন থাক সে কথা।



বিস্তীর্ণ উপত্যকা ক্রমশ উন্মুক্ত হচ্ছে

কিছুদূর পর্যন্ত হেমকুণ্ড এবং ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স-এর পথ একই। তারপর হেমকুণ্ডের পথ সোজা এগিয়ে গেছে, আর ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্সের পথ চলে গিয়েছে বামে। একটা বোর্ডে নির্দেশও আছে। সাতটায় ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্সের গেট-এ এন্ট্রি শুরু হয়। আমি সাড়ে সাতটায় পৌঁছে গেলাম। আধার কার্ড দেখাতে একটা রেজিস্টারে নাম, ঠিকানা লিখে আর এন্ট্রি ফি ১৫০ টাকা নিয়ে আমাকে যেতে দিল। জানালো, বিকাল ৫ টার মধ্যে ফিরে আসতে হবে। অফিশিয়াল টাইম ৫.৩০, তবু ওরা ৫.০০ তেই ফিরতে বলে। ৬টার মধ্যে ফিরে না এলে নিখোঁজ যাত্রীর



উপত্যকার মাঝে পায়ে চলা পথ

অনুসন্ধানের জন্য সার্চ পার্টি যায়। প্রসঙ্গত, প্রবেশমূল্য ১৫০ টাকা মোট তিন দিনের জন্যে নেওয়া হয়। ওই টিকিটে

পরবর্তী দু-দিনও ভ্যালিতে ঢোকা যাবে। তবে খুব কম দর্শকই দ্বিতীয়বার আসে।

সৌভাগ্যক্রমে আকাশ আজ মেঘমুক্ত। বড় বড় গাছের মধ্যে দিয়ে সরু পথ ধরে এগিয়ে চললাম। বাম দিকে তীব্র স্রোতস্বিনী পুষ্পবতী নদী বয়ে চলেছে অদূরে একটা জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে। তার ঠিক আগেই একটা সেতু আছে, যার ওপর দিয়ে পুষ্পবতী নদী পেরিয়ে নদীকে ডানদিকে রেখে পথ এগিয়ে গেছে।

প্রায় কুড়ি মিনিট চলার পর উপত্যকার প্রকৃত বিস্তার বোঝা গেল। দিগন্তে উঁচু পাহাড়ের সারি দেওয়ালের মতো ঘিরে রেখেছে এই উপত্যকাকে। কিছু দূরে দূরে ঝর্ণা নেমে এসেছে উপত্যকার বুকে। সামনে পথ ঢালু হয়ে নেমে



পথের পাশে নাম না জানা ফুল

গেছে। কতদূর গেছে বোঝার উপায় নেই, কারণ এক একটা হাম্প বা উঁচু ক্ষেত্র পেরোনোর পর পরবর্তী অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। চলার পথে জলের অভাব নেই। নানা জায়গা থেকে ঝর্ণা নেমে এসেছে। অনেক জায়গায় জলধারার উপর ছোটো ছোটো সেতু পেরিয়ে এগোতে



ফুলের উপত্যকা

হচ্ছে। চারপাশে ছোটো গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। নানা রঙের ফুল তাতে। উপত্যকায় বড় গাছ খুবই কম। মাথার উপর সূর্য থাকায় ঠাণ্ডা লাগছে না। জ্যাকেট খুলে রেখেছি।

পথে কয়েকজন ট্যুরিস্ট দেখলাম। তবে যত এগোচ্ছি নতুন করে ট্যুরিস্টের দেখা আর মিলছে না। অনেকেই কিছুদূর এসে, ফটো তুলে আবার ফিরে যায়।

ফুলের পরিমাণ খুব বেশি নয়। আজ জুন মাসের ৩০ তারিখ। আর একটু বেশি ফুল আশা করেছিলাম। তবুও পথের ধারে অনেক ফুলই দেখেছি। বেশি যে ফুল চোখে পড়ছিল, তা হল ব্লু পপি আর পাহাড়ী গোলাপ। ফুল ছাড়াও, এই উপত্যকার সৌন্দর্যও কিছু কম নয়।

এক সময় দেখলাম পথনির্দেশ দেওয়া আছে। টিপ্রা খড়ক সোজা এবং জন মার্গারেট লেগির কবর ডানদিকে। প্রথমে টিপ্রা খড়কের দিকে এগোলাম। অনেকটা চলার পরে দেখলাম উপত্যকা ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে আর বহুদূরে টিপ্রা খড়ক গ্লেনসিয়ার। তবে অতদূর গেলে সময়মতো ফেরা কঠিন। তাই গ্লেনসিয়ার পর্যন্ত না যাওয়াই মনস্থ করলাম।

আমার মতে, কেউ যদি গ্লেনসিয়ার পর্যন্ত যেতে চায়, তাহলে প্রথম থেকেই সেই লক্ষ্যে স্থির থেকে দ্রুত পথ চলতে হবে। চারপাশ দেখতে দেখতে, ফটো তুলতে



জন মার্গারেট লেগির কবর

তুলতে এগোলে গ্লেনসিয়ার পর্যন্ত পৌঁছে আবার ফিরে আসা কঠিন। সেক্ষেত্রে ফেরার সময় প্রায় দৌড়ে আসতে হবে। বড় গাছ নেই। একটা বড় ঝোপের ছায়ায় বসে রইলাম। কোথাও কোনো শব্দ নেই। প্রজাপতি আর কিছু পাখি ছাড়া কোনো জন-প্রাণীও নেই। শুধু হাওয়ায় অবিরাম দুলে যাওয়া ঝোপ-ঝাড় আর বাতাসের শন-শন শব্দ। এত শান্তির জায়গা, এত সুন্দর জায়গা যে সত্যিই আছে তা

হিমালয়ে না এলে বোঝা যায় না। ঘড়িতে দেখলাম দুপুর ১টা বেজে গেছে। সঙ্গে আনা চিড়ে ভিজিয়ে খেলাম।

এবার ফেরার পালা। ফেরার পথে লেগির কবরটা



লেগির কবরের বিপরীতে ক্ষণিকের বিশ্রাম  
(ছবিটি ক্যামেরার স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তোলা)

অবশ্যই দেখে যেতে হবে। যে মহিলা ফুল নিয়ে গবেষণা করতে স্বদেশ, স্বজন ছেড়ে এই দুর্গম উপত্যকায় এসেছিলেন এবং এখানেই কাজ করতে করতে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়ে মারা যান, তাঁর কবরের সামনে দু-দণ্ড না দাঁড়ালে ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স দেখা সম্পূর্ণ হয় না।

ফেরার সময় বামদিকের সরু পায়ে চলা পথ ধরে কিছুটা এগোতে দেখতে পেলাম সেই কবর। প্রকৃত কবরটির ভগ্নদশা হয়ে যাওয়ায় পরবর্তীকালে এটির পুনর্নির্মাণ করা হয়। বিপরীতে পাথর সাজিয়ে তৈরি একটা বসার জায়গা। সেখানে কিছু ক্ষণ বসলাম। তারপর আবার ফিরে চলা। ফেরার সময় কিছু ট্যুরিস্টের দেখা পেলাম। জলপ্রপাতের কাছে যখন পৌঁছলাম, তখন প্রায় সাড়ে চারটে বাজে। সেখান থেকে ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্সের গেট আর বেশিদূর নয়। আমার পিছনেও কিছু ট্যুরিস্ট রয়ে গেছে যারা ধীরে ধীরে আসছে। সুতরাং ধীরে সুস্থে গেট-এ এসে পৌঁছলাম। নাম এবং সিরিয়ালটা জানিয়ে এগিয়ে চললাম ঘাস্কারিয়ার দিকে।

ঘাস্কারিয়ায় পৌঁছে ঘোড়ার আস্তাবলের কাছে বসে দেখছি যে একের পর এক ঘোড়া যাত্রী নিয়ে ফিরছে হেমকুণ্ড থেকে। ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে যাত্রীরা নামছে ঘোড়ার পিঠ থেকে। এক বয়স্ক যাত্রী পায়ে হেঁটে ফিরছিলেন। একটা বসার জায়গা দেখে ধপ করে বসে পড়লেন। বসার ভঙ্গী দেখে মনে হল শরীরে আর এক বিন্দু শক্তি অবশিষ্ট নেই। আগামীকাল আমার হেমকুণ্ডে যাবার পরিকল্পনা। শুনেছি পথ বেশ কঠিন। একটাই ভরসা, ইতিপূর্বে এর থেকে বেশি



উঁচু কয়েকটি গিরিবর্ত পেরিয়েছি। পথের পাশে একটা দোকানে গরম দুধ আর জিলিপি খেয়ে গেস্ট হাউসে ফিরলাম। ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স-এ অনেকটা পথ হাঁটলেও চড়াই তেমন ছিল না। পথও সুন্দর ছিল, তাই তেমন একটা পরিশ্রান্ত লাগছে না। আগামীকালের জন্য ব্যাগ গুছিয়ে রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

ভোরবেলায় বিছানায় শুয়ে শুনতে পেলাম বৃষ্টির



বৃষ্টিকে সাথী করে হেমকুণ্ডের পথে

শব্দ। কিছুক্ষণ কেটে গেলেও বৃষ্টি থামছে না। দিল্লীর দলের সদস্যরা আলোচনায় বসেছে কী করবে। হেমকুণ্ড যাওয়ার জন্য বৃষ্টি থামার অপেক্ষা করবে, না কি গোবিন্দঘাটের দিকে নামতে শুরু করবে। বৃষ্টির শব্দ আর ওদের আলোচনা শুনে আমি বিছানা ছেড়ে ওঠার প্রয়োজন মনে করলাম না। এই আবহাওয়ায় হেমকুণ্ড ট্রেক-এর কোনো প্রশ্নই আসে না। দরকার হলে একটা দিন আমি অপেক্ষা করতে পারি। দেখা যাক। প্রায় সাড়ে সাতটায় বৃষ্টি একটু কমলে দিল্লীর দলটা সিদ্ধান্ত নিল আজই ওরা গোবিন্দ ঘাট নেমে যাবে। আটটা



বরফের সাথে সেলফি তোলায় মগ্ন এক যাত্রী

নাগাদ দেখলাম বৃষ্টি প্রায় থেমে গেছে। ছিটেফোঁটা পড়ছে, তবে আকাশ মেঘলা। আমি চিন্তা করলাম, বৃষ্টির সঙ্গে মোকাবিলা করার সব উপকরণ যখন সঙ্গে আছে, তখন এই বৃষ্টিতে ভয় কী! একবার দেখা যাক, যদি বৃষ্টি বেড়ে যায়, তবে ফিরে আসার পথ তো খোলাই আছে। দ্রুত প্রাতরাশ সেরে রেনকোটে শরীর এবং পিঠের ছোটো ব্যাগটা ঢেকে লাঠিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বৃষ্টি না হলে আরো অন্তত দেড় ঘণ্টা আগে বেরোতাম। বুঝতে পারছি দ্রুত চলতে হবে। বৃষ্টি জোরে না পড়লেও টিপ টিপ করে পড়েই চলেছে।

একা আছি দ্রুত চলতে সমস্যাও নেই। কিন্তু কিছুক্ষণ চলার পর দেখলাম, পথ পুরোটাই খাড়া চড়াই। ১০ ফিট পথও সমান নেই। পাথর কেটে এমন ধাপ করে দেওয়া আছে, যাতে ঘোড়া কোনক্রমে উঠতে পারে। কিছু দূরে দূরে বিশ্রামের জন্য বসার জায়গা আছে। কিন্তু বৃষ্টির দিনে কে আর বসবে। কেউ কেউ ঘোড়ার পিঠে বসে “ওয়াহে গুরু” জপ করছে, পথের অবস্থা দেখে ইস্তামা জপার মতো। রেনকোটে শরীর ঢেকে অনেকে হেঁটেও চলেছে। যত এগোচ্ছি, চড়াই যেন ততই বাড়ছে। সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে শিখ তীর্থযাত্রীদের শারীরিক শক্তি ও মনের জোর অনেক। এই প্রতিকূল আবহাওয়ায় এ রকম চড়াই ভেঙ্গে এত পথ অতিক্রম করার চেষ্টা করাটাও সাহসিকতার পরিচয়। এক একটা বাঁক উঠছি আর একটু দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছি। অর্ধেকের বেশি পথ উঠে এসেছি। একটা বার্ণার কাছে দেখলাম বরফের ক্ষেত্র।



গুরুদ্বার, হেমকুণ্ড

শীতের বরফ এখনও গলেনি। অনেকে সেখানে ফটো তুলছে।

যদি আকাশ পরিষ্কার থাকতো, তাহলে এখান থেকে অনেক বিখ্যাত পর্বতশৃঙ্গ দেখা যেত। কিন্তু আজ চারপাশ ঘন কুয়াশায় ঘেরা। চলার পথটা ছাড়া আর কিছুই প্রায়

দেখা যাচ্ছে না। তবু নজর কাড়লো পথের ধারে অবহেলে ফুটে থাকা অসংখ্য ব্রহ্মকমল। এ পথে প্রচুর দেখা যায়।

পথ যখন প্রায় শেষ, সেরকম জায়গায় চূড়ায় ওঠার দুটো বিকল্প আছে। একটি রেলিং লাগানো খাঁড়া সিঁড়ি আর অপরটি পাকদণ্ডী হাঁটা পথ, যে পথে ঘোড়া চলে। আগে



১৫০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত সরোবর হেমকুণ্ড

ইউটিউবের দৌলতে এই জায়গাটার ভিডিও দেখেছিলাম। যারা রেলিং লাগানো সিঁড়িপথে উঠেছে তারা সকলেই বারণ করেছে এই পথে না উঠতে। আমি তাই পাকদণ্ডী পথটাই ধরলাম। এত খাঁড়া না হলেও সে পথও সহজ ছিল না। আসলে এই উচ্চতায় অক্সিজেন কমে আসার জন্য সামান্য চড়াই পথও অনেক বেশি কষ্টকর মনে হয়। এক সময় দ্বারের ঘণ্টার আওয়াজ মনোবল বাড়ালো। ক্রমে পতাকা আর কিছু দোকান দেখতে পেলাম তখন প্রায় দেড়টা বাজে। দুটোর সময় মন্দির বন্ধ হয়ে যায়। এখনও অনেক তীর্থযাত্রী বেশ পিছনে রয়েছে। জানিনা তাদের ভাগ্যে আজ আর মন্দির দর্শন হবে কি না!



ঘাঙ্গারিয়া থেকে গোবিন্দঘাটের দিকে পায়ে চলা পথ

প্রথমেই গেলাম হেমকুণ্ডের তীরে। অপর পাড় দেখা যাচ্ছেনা ঘন কুয়াশার জন্য। ইউটিউব-এ দেখেছি এখানে পুণ্যার্থীদের স্নান করতে। তবে আজ একজনকেও দেখলাম না জলে নামতে। কেউ কেউ জলে হাত দিয়ে সেই জল মাথায় ছিটিয়ে নিচ্ছে। মাইকে ধর্মীয় সঙ্গীত বাজছে। পৃথিবীর মধ্যে এটি শিখদের সর্বোচ্চ গুরুদ্বার। শিখদের ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থ সাহেবে রয়েছে, দশম ধর্মগুরু গোবিন্দ সিং এই সরোবরের তীরে সাধনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই স্থানে মন্দিরটি তৈরি হয়। শীতে প্রচুর বরফের ভার বহন করার জন্য এর বিশেষ গঠনশৈলী স্বতন্ত্র।

দেরিতে যাত্রা শুরু করেছি। আবহাওয়াও ভালো নয়। যখন তখন আবার বৃষ্টি নামতে পারে। তাই গুরুদ্বার দর্শন সেরে, হেমকুণ্ডের জল মাথায় ছিটিয়ে, দাতব্য ভোজনালায়ে স্টীলের প্লাসে চা খেয়ে ফেরার পথ ধরলাম। নামার সময় পরিশ্রম অনেক কম। দ্রুত নামছি। দু-ঘণ্টার একটু পরে দিনের আলো যথেষ্ট থাকতে থাকতেই নেমে এলাম ঘাঙ্গারিয়া। পায়ের ওপর অনেক ধকল গেছে। পা দুটো বিশ্রাম চাইছে। মনে পড়ছে গতকাল দেখা শ্রৌচ শিখটির কথা। যাত্রাশেষে ধপ করে কীভাবে পাথরের ওপর বসে পড়েছিলেন।



সবুজ গাছপালায় ঢাকা পায়ে চলা পথ

ঘাঙ্গারিয়া গুরুদ্বারের কাছে একটা দোকান থেকে পকোড়া কিনে গেস্ট হাউসে ফিরলাম। ঠিক করলাম কাল নিচে নেমে যাব। আমার হাতে একটা দিন অতিরিক্ত আছে। ওই দিনটা আমি বদীনাত ধামে কাটাতে পারি, নয়তো যোশিমঠ গিয়ে আউলি দেখে পরের দিন হরিদ্বারে ফিরতে পারি। ভীড় এড়াতে যোশিমঠ যাওয়াই মনস্থ করলাম। রাতে গেস্ট হাউসের ক্যান্টিনে রাতে খাওয়া সেরে ব্যাগ গুছিয়ে নিলাম। কাল সকাল হলেই রওনা দেব।

সকালে উঠে দেখলাম আবহাওয়া ভালোই। রোদ না

থাকলেও বৃষ্টি হচ্ছে না। নামতে শুরু করে প্রথমেই চোখে পড়ল সেই হ্যালিপ্যাড। তারপর পুষ্পবতী নদীর বাম দিক দিয়ে পথ। একটা দোকানে ছোলা আর শসা মাখা খেলাম। এক সময় পথ সেতুর ওপর দিয়ে পুষ্পবতী নদী অতিক্রম করে ডানদিক দিয়ে পথ।

এই পথটা খুবই সুন্দর। পাথরে বাঁধানো ঢালু পথ। দুপাশে গাছ। তাদের ডালপালা চাঁদোয়ার মতো ছায়া করে রেখেছে পথ। কিছু দূরে দূরে বসার জায়গা এবং কিছু দূরে দূরে টয়লেট রয়েছে। আগে গোবিন্দঘাট থেকে পুরো পথটাই (১২ কিমি) হেঁটে যাতায়াত করতে হতো। বর্তমানে পুলনার পর থেকে শেষ ৪ কিমি পথে গাড়ি চলাচল শুরু হয়েছে। সুতরাং হাঁটাপথ কমে দাঁড়িয়েছে ৮ কিমিতে।

হাঁটতে হাঁটতে একটা বাঁক থেকে দেখলাম অনেক নিচে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, অর্থাৎ দূরে পুলনা দেখা যাচ্ছে। গাড়ির স্ট্যান্ডে পৌঁছে দেখলাম সুমো, বোলেরো প্রভৃতি দশ সীটার গাড়ি সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে। পাহাড় থেকে নামা গোবিন্দঘাটের যাত্রীরা একে একে উঠে পড়ছে গাড়িতে। দশজন হলেই ছেড়ে দিচ্ছে। ভাড়া ৫০ টাকা। খুব ঢালু পাকদণ্ডী পথ। গাড়ি চালাতে দক্ষ ড্রাইভার প্রয়োজন।



নরসিং মন্দির, যোশিমঠ

গোবিন্দঘাটে পুষ্পবতী নদীর কাছে গোবিন্দঘাট গুরুদ্বার সংলগ্ন সেতুর কাছে গাড়ি থামল। চড়াই বেয়ে মূল সড়কে উঠে এলাম। এখানে ছোটো-বড়ো যত গাড়ি দেখা যাচ্ছে সবই রিজার্ভ করা। আমার মতো দলছুট ট্রেকারের পক্ষে পরিস্থিতি অনুকূল নয়। কীভাবে যোশিমঠ যাবো ভাবছি। ব্যাগ মাথায় হাঁটতে থাকা কয়েকজন যাত্রীকে অনুসরণ করে মূল সড়কের উপরেই একটা বাজার অঞ্চলে পৌঁছলাম। সেখানে একটা বাসও দাঁড়িয়ে আছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম এই বাস হরিদ্বার যাবে। তবে আজ যাত্রা করে কাল পৌঁছবে। রাতে পথে কোথাও যাত্রাবিরতি হবে। যোশিমঠ এখান থেকে প্রায় ২ ঘণ্টার পথ। আমি যোশিমঠ যাবো ঠিক করে ওই বাসে উঠে বসলাম। প্রায় আধঘণ্টা পরে বাস ছাড়লো। দুপুর নাগাদ পৌঁছলাম যোশিমঠ। যোশিমঠ যেখান থেকে হরিদ্বারের বাস ছাড়ে, তার কাছেই একটা হোটেলে উঠলাম। মধ্যাহ্নভোজ সেরে গুগলম্যাপ অনুসরণ করে আউলিগামী রোপওয়ের কাছে পৌঁছলাম। রোপওয়ের টিকিট কাউন্টার খোলা আছে। একজন কর্মী টিকিট কাটার জন্য বসেও আছেন, কিন্তু রোপওয়ে চলছে না। কমপক্ষে দশ জন না হলে রোপওয়ে চলবে না। আর তখনো পর্যন্ত আমিই একমাত্র যাত্রী। আউলি যাওয়া এবং আসার ভাড়া মাথাপিছু এক হাজার টাকা। আউলিতে এখন বরফ নেই সুতরাং অফ সীজন। দশজন যাত্রী হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে তাই অপেক্ষা না করে প্রত্যাবর্তন করলাম।

এরপর গুগল ম্যাপ দেখেই চললাম যোশিমঠের বিখ্যাত নরসিং মন্দির দর্শনে। স্থাপত্য দেখার মতো। মন্দিরের মধ্যে ফটো তোলা নিষেধ। পাশেই আদিগুরু শঙ্করাচার্যের আশ্রম। তিনি এখানে পাঁচ বছর তপস্যা করেছিলেন। এই স্থানের নাম তিনিই দেন জ্যোতির্মঠ, যা পরবর্তীকালে লোকমুখে যোশিমঠ হয়েছে। তখন বিকাল। বিশেষ কিছু করার নেই। আশেপাশে কিছুটা ঘোরাঘুরি করে হোটেলে ফিরে এলাম। সন্ধ্যায় বাসের টিকিট কাউন্টারে খোঁজ নিয়ে জানলাম হরিদ্বারগামী বাস আসার কথা। যদি রাতে বাস আসে, তাহলে কাল ভোর পাঁচটায় ছাড়বে। টিকিট তখনই হবে। রাতে হোটেলের জানলা দিয়ে দেখলাম বাস এসেছে। অর্থাৎ কাল যাওয়া নিয়ে সংশয় নেই।



ভোর রাতে উঠে রেডি হয়ে রুকস্যাক নিয়ে বাসের কাছে পৌঁছলাম। তখনও পাঁচটা বাজতে ২০ মিনিট বাকি। ভাবলাম আমি বোধহয় তাড়াতাড়ি পৌঁছেছি। কিন্তু ভুল ভাঙল বাসের দিকে তাকিয়ে। ভিতরের আসন সব ভর্তি। কে জানে কত আগে থেকে লোকজন এসে বসে আছে। কাউন্টারে টিকিট কাটতে আমার সিট হল ড্রাইভারের পাশে কেবিনে। উইন্ডস্ট্রীনের কাছে বসলাম। বাস অন্ধকারের বুক চিরে এগিয়ে চলল। পথের বিবরণ নতুন কিছু নয়। পাহাড় আর পাহাড়। তার মধ্যে দিয়ে পাকদণ্ডী পিচের রাস্তা এত ভোরে পথে অন্য যানবাহন কম বলে বাস দ্রুত চলছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ চলার পর দুই রাস্তার সংযোগস্থলে এসে বাস থেমে গেল। পুলিশ রাস্তা আটকে দিয়েছে। সামনে ধ্বস নেমেছে। অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে হবে। ড্রাইভার রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে স্টার্ট বন্ধ করে দিল। কন্ডাক্টর যাত্রীদের জানালো, ঘুরপথে যেতে হবে, এজন্য একশো টাকা করে অতিরিক্ত লাগবে। সকলে রাজি থাকলে বাস এগোবে, না হলে নয়। যাত্রী প্রায় সকলেই হাষিকেশ বা হরিদ্বারের যাত্রী। সুতরাং রাজি না হয়ে উপায় কী! আবার গাড়ি ছাড়লো। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বাস

হরিদ্বার পৌঁছালো। তখন সন্ধ্যা হতে একটু সময় বাকি। গঙ্গা আরতির প্রস্তুতি চলছে। আমি গঙ্গা পেরিয়ে গঙ্গার তীরে পূর্ব পরিচিত মিশ্র ভবনে উঠলাম। তারপর একটা দিন হরিদ্বারে ঘুরে, নানা হোটেলে নতুন নতুন খাবারের স্বাদ গ্রহণ করে পরদিন রাতে উঠে বসলাম হাওড়াগামী ট্রেনে।

চোখ বন্ধ করলে ভেসে উঠছিল দিগন্ত বিস্তৃত ফুলের উপত্যকা, তীর গর্জনে ছুটে চলা পুষ্পবতী নদী, লেগির কবর, লাঠি হাতে “ওয়াহে গুরু” ধ্বনিতে তীর্থযাত্রীদের এগিয়ে চলা।

ফুলের উপত্যকায় হয়তো তখনও অবিরাম প্রজাপতিদের ওড়াউড়ি, রোদ, মেঘ, বাতাসের খেলা। ফুলের গাছগুলির আয়ু আর মাত্র দু-তিন মাস। তারপর আবার বরফ পড়তে শুরু করবে। সম্পূর্ণ উপত্যকা পুরু বরফের চাদরে ঢেকে যাবে। আগামী বছর গ্রীষ্মে বরফ গলে আবার সৃষ্টি হবে নতুন গাছ। সবুজ হবে প্রান্তর। ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স এর এটাই নিয়ম। এ নিয়ম প্রকৃতির। এ নিয়ম সার্বজনীন।



হরিদ্বার

# MATH SUDOKU

Ankita Rojariya

4				7	8			
	5	1	3	9				
	6		4	2				
		8						
9		2				3		
		5	6					1
			5					6
			2			1		4
		3						7

4	2	9	1	7	8	6	5	3
8	5	1	3	9	6	7	4	2
3	6	7	4	2	5	8	1	9
6	1	8	9	4	3	2	7	5
9	4	2	7	5	1	3	6	8
7	3	5	6	8	2	4	9	1
2	8	4	5	1	7	9	3	6
5	7	6	2	3	9	1	8	4
1	9	3	8	6	4	5	2	7

## CULTURAL ACTIVITIES OF THE CENTRE : 2023-2024

**Pritam Roy & Anusree Sen**

### ***Bose Fest : 2023***

The S. N. Bose National Centre for Basic Sciences (SNBNCBS) is an independent research institution focused on fundamental sciences, honouring the esteemed physicist Prof. Satyendra Nath Bose. At SNBNCBS, scholars are highly motivated and dedicated to advancing scientific knowledge. In addition to their academic pursuits, researchers also showcase their talents through various cultural activities. These activities, organized primarily by the centre's recreation club, Muktangana, serves as a platform for artistic expression, fostering a vibrant community where scholars can nurture their talents beyond the realm of academia.

Bose Fest 2023 and 2024 were both celebrated with great enthusiasm, much like in previous years. In 2023, the festival took place from March 1st to March 3rd, while in 2024, it was held from February 22nd to February 24th, drawing active participation from both academic and non-academic members of the Centre. This annual event serves as a platform primarily for young researchers to showcase their scientific and cultural endeavours. Over the first two days, PhD students and postdocs from the institute presented their research findings through oral and poster presentations. The event's primary objective is to foster an environment of collaboration and knowledge exchange among research scholars, encouraging them to explore diverse research areas and engage in constructive scientific dialogues.

Besides the scientific proceedings, the Bose Fest celebrations on March 2nd featured a cultural performance by the Bengali folk band "Dohar."



***"Dohar" Band at Bose Fest 2023***

Additionally, the 'Bosons' of Muktangana curated a deeply moving cultural program during Bose Fest 2023. This soul-stirring event took place in the afternoon of March 3rd, 2023 at the playground near the West Gate of SNBNCBS, Salt Lake.

The program commenced with a beautiful inaugural dance performed by Anusree Sen. Following this, the audience was inspired by motivational speeches delivered by our Director, Prof. Tanusri Saha Dasgupta, and Registrar, Ms. Shohini Majumder. The event proceeded with a prize-giving ceremony honouring the winners from various sports tournaments, as well as recognizing outstanding oral and poster presenters. Next, there was a wonderful recitation named "Chithhi" by Tanima Nandi. the following performance was a special group musical performance by Anwesha Chakrabarty, Arnab Mukherjee, and Sudip Chakrabarty. Thereafter, we had a captivating recitation on mental health titled "Amar Atmahattya" by Ananya Chakrabarty. Then there was a mesmerizing group dance performance by Anusree Sen, Debayan Mondal, and Swarnali Hait on "Hey Katha Sangram Ki".

The subsequent performance featured a fusion of music and recitation named "Prothom Alo" by Pallabi Roy and Soham Sen. Then, we had a group performance featuring a social comedy drama titled "Narak Gulzar" written by Manoj Mitra. The portrayal included performances by Ardhendu Pal, Anupam Gorai,

Jayarshi Bhattacharya, Sudip Chakrabarty, Soumen Mondal, Sabuj Mandal, Bidhan Kumbhakar, Prapti Mukherjee, and Sourav Mondal.



*A Glimpse of the Drama*

Next, there was a solo recitation by Indrani Bhattacharya, titled “Ami sei Meye”. Then we had a fusion of music and recitation by Pallabi Roy and Suravi Pal.

The cultural event reached its peak with an outstanding contemporary performance titled “The Cultural Heritage of India” executed by the team comprising Debayan Mondal, Anusree Sen, Avanti Chakraborty, Swarnali Hait, Anupam Gorai, Swapnomoy Pramanik, Rudra Prasad Sarkar, Arpita Jana, Amrita Mandal, Riya Barick, Snehamayee Hazra, and Sakshi Caudhary.



*Group Dance Performers*

Next, Arun Kumar Das performed a recitation titled “Rasta Chharo”. The event concluded with “A Special Musical Performance” performed by our SNB Music Band, featuring Soham Sen, Sudip Chakrabarty, Soham Saha, Shovan Dev Mondal, Rahul Haque, Nishant Garg, Koustav Dutta, Purushottam Majhi and Prapti Mukherjee .



*The Special Musical Performance*

Ananya Chakrabarty and Soham Saha masterfully guided the entire cultural programme on March 3rd, infusing it with a blend of joy and entertainment.



*A Subset of SNB Family at Bose Fest 2023*

### ***Bose Fest : 2024***

During Bose Fest 2024, the festivities were enriched with cultural delights. On February 23rd, attendees were treated to a mesmerizing performance by Monomoy Bhattacharya, adding a melodious touch to the celebration. Furthermore, on the afternoon of February 24th, 2024, near the West Gate of SNBNCBS, Salt Lake, the ‘Bosons’ of Muktangan curated a deeply moving cultural program, fostering a sense of unity and camaraderie among participants, much like previous years. The program commenced with a captivating inaugural song performed by Soham Sen. Following this, the audience was inspired by motivational speeches delivered by esteemed figures including our Director. Prof. Tanusri Saha Dasgupta, Dean of Academic programme, Prof. Amitava Lahiri, Dean of Faculty, Prof. Anjan Barman, and Registrar, Ms. Shohini Majumder. The event culminated with a prize-giving ceremony honouring winners from various sports tournaments, as well as recognizing outstanding oral and poster presenters.



*Manomoy Bhattacharya at Bose Fest 2024*



Despite facing historical suppression, women emerge resiliently, embodying limitless potential as nurturers, companions, and trailblazers. Following the prize distribution program, our institute's research scholars, including Anupam Gorai, Swarnali Hait, Debayan Mondal, Avanti Chakraborty, Anushree Sen, Saheli Mukherjee, Bipasha Hazra, and Sayanti Mondal, delivered an outstanding group dance performance based on theme "Women Empowerment".



*"Women Empowerment" Dance Performance*

The next performance was a group special titled "Mastermoshai" paying tribute of Prof. S. N. Bose by his iconic student, Bhanu Bandopadhyay.



*A glimpse of "Mastermoshai"*

The performers included Rajdeep Biswas, Pritam Roy, Madhurita Das, Pallabi Roy, Ritam Mahanta, Prof. Suman Chakraborty, Rima Ghosh, and Rupayan Saha.

The next performance featured two soulful Bengali songs, "Amar Bhitro Bahire" and "Alada Alada Sob" rendered by Dr. Indrani Bhattacharya. Afterward, there was a semi-classical dance performance by Ananya Chakraborty and Debayan Mandal.

Following that, a humorous Bengali audio drama titled "Paka Dekha" was performed by Pallabi Roy & Rajdeep Biswas. Subsequently, a solo dance performance on the song "Mitwa" was presented by Sayanti Mandal. This was followed by a Hindi song performed by Suranjana Chakraborty. Afterwards, there was a special group performance involving dance and recitation titled "Bosonto ke Sakhi Rekhe" by

Anusree Sen & Pallabi Roy. the next performance featured a social comedy drama titled "Lakh Takar Swopno" written and directed by Rupam Porel. The brilliant portrayal included performances by Rupam Porel, Ardhendu Pal, Anuradha Seth, Anupam Gorai, Jayarshi Bhattacharya, Dhananjoy Ghosh, Bipasha Hazra, Suvodip Mukherjee, Koushik Das, Sourik Dutta, Sudip Chakraborty, Pritam Roy, Kapil Gope, and Swarnali Hait.



*A Glimpse of The Drama*

Next, there was a solo recitation by Ananya Chakraborty, featuring a self-written poem. Again, there was a semi-classical dance performance to the song "Apne Hi Rang De" by Bidisha Sarkhel. Following that, there was a solo singing performance of "Badrang Mein Satranga Hai Yeh Ishq Re" by Soma Dutta.

The cultural event reached its peak with an outstanding contemporary dance and acting performance titled "Transition of Bollywood Songs (1970's to 2020's)" executed by the team



*A Glimpse of Transition of Bollywood Songs*

comprising Debayan Mondal, Anusree Sen, Avanti Chakraborty, Swarnali Hait, Anupam Gorai, Saheli Mukherjee, Bipasha Hazra, Sayanti Mondal, Rajdeep Biswas, Debojit Sen, Swapnamoy Pramanik, Dhananjoy Ghosh, Kousik Das, Rudra Prasad Sarkar and Arun Kumar Das.

And finally, the event concluded with "A Mashup of Regional Songs Representing the Cultural Richness of India" performed by our SNB Music Band, featuring Soham Sen, Shinjini

Paul, Sudip Chakrabarty, Soham Saha, Shovan Dev Mondal, Soumyadipta Chakraborty, and Soma Dutta.



### *The Special Musical Performance*

Suranjana Chakraborty and Arpita Jana skilfully anchored the entire cultural program on February 23rd, infusing it with fun and entertainment. Similarly, on February 24th, Suranjana Chakraborty and Aresh Bera took charge, ensuring the event was brimming with amusement and enjoyment. We extend our gratitude for the technical assistance provided by Arpita Jana, Sourav Mandal, Archisman Sinha during the cultural program.

Simply offering a collective congratulation to all members wouldn't suffice for the success of

Bose Fest this year. Special recognition is due to the students for spearheading the organization of the fest, as well as the panel of judges for dedicating their valuable time to every discussion, presentation, and ensuring flawless execution-a task among the most challenging in the entire fest. It's our aspiration that the remarkable spirit of Bose Fest will continue to inspire all our endeavours and relationships. We anticipate that similar Occasions will become a regular feature in the future.



### *A moment to Cherish : Our SNB Family cheering together at Bose Fest 2024*



A girl who loves to hide

Ananya Chakraborty



Netaji

Bipasha Hazra

## SPORTS ACTIVITY IN THE CENTRE : 2023-2024

### Sports Activities in 2023

*Coordinators : Shinjini Paul, Animesh Hazra*

What force could be more potent, that binds a group of individuals into a cohesive unit transcending their personal limits, to secure victory in a game? In the hustle and bustle of our daily lives sports activity promotes the unity and integrity among the individuals. Sports not only offers a means to counteract the detrimental effects of a sedentary routine but also essential for a healthy and balanced life. Much like in many other academic institutions, sports activities play an integral role in the life of this centre. The Annual Sports Tournament 2023 held at S. N. Bose National Basic Science Centre was a resounding success, bringing together students, faculty, and staff in an atmosphere of enthusiasm and camaraderie. The event, organized by the “Sports Activity Wing” of Muktagan, was a testament to the vibrant sporting culture of the institution and its commitment to promoting physical fitness and well-rounded development. The endless efforts from all the sports organizers helps us to conduct a glitch-free tournament this year.

Sincere acknowledgment of Prof. Tanusri Saha-Dasgupta (Director), Ms. Shohini Majumder (Registrar), Mr. Debashish Bhattacharjee (DR. Admin), Smt. Nibedita Konar (DR Academic) for their endless supports and positive attitude towards all sports activities. Special thanks to Mr. Siddhartha Chatterjee, Mr. Supriyo Ganguly, Mr. Suvendu Dutta, Mr. Swarup Dutta, Mr. Amitava Palit to make the events successful. Gratitude towards Mr. Narayana Mondal and team for preparing beautiful ground and Mr. Tanmoy Sil and team for arrangements of lights. Finally, congratulation to the entire SNB sports community for their unwavering passion and commitment to sports.

#### *Intra-institute tournaments in 2023*

Cricket Tournament (4-5th Feb, 2023)  
Champions : Pratap Pal's Team  
Runners Up : Animesh Hazra's Team  
Best Batsman : Shubham Purwar  
Best Fielder : Anirban Paul  
Best Bowler : Pratap Pal  
Emerging Player : Sabuj Mandal  
Man of the Tournament : Shubham Purwar,  
Tanmoy Chakraborty

#### *Football Tournament (23-25th Jan, 2023)*

Champions : Anirban Paul's Team  
Runners Up : Samir Rom's Team  
Emerging player : Sabuj Mandal, Pratap Pal  
Best Goalkeeper : Jayarshi Bhattacharya  
Best Defender : Sayan Ghose, Neeraj Kumar  
Fair Play Award : Aishwaryo Ghosh  
Man of the Tournament : Pritam Bag

#### *Badminton Tournament (27-28th Jan, 2023)*

Champions : Sayan Ghose's Team  
Runners Up : Jayarshi Bhattacharya's Team  
Emerging player : Sudip Pramanik, Rudra Prasad Sarkar  
Best Player Male : Sayan Ghosh  
Best Player Female : Swarnali Hait

#### *Table Tennis Tournament (6-7th July, 2023)*

Champions : Soham Saha's Team  
Runners Up : Ardhendu Pal's Team  
Emerging Player : Ramkrishna Patra, Rudra Prasad Sarkar  
Man of the Tournament : Krishnendu Sinha

#### *Carrom Tournament (4-5th July, 2023)*

Emerging Player : Sudipta Mitra  
Player of the Tournament : Subhrasish Mukherjee  
Doubles Champion : Banik's Team  
Doubles Runner-up : Avijit Mondal's Team



## SOME GLIMPSES OF THE SPORTS TOURNAMENTS IN 2023



*Cricket*



*Badminton*



*Table Tennis*



*Carrom*



## Sports Activities in 2024

*Coordinators : Bivas Mallick, Saheli Mukherjee*

Another year passed; we are now in 2024. Sports activities should never stop. It plays a crucial role in one's life. When one is stuck with monotonous routine and mundane life-style, it is one of the most effective stress busters. Apart from improving one's cognitive abilities and physical health, it helps to lead a more disciplined and courteous life. S. N. Bose National Centre for Basic Sciences always provides a platform to showcase talents and bring them to the forefront, not only in the form of research, but also in the form of various sports tournaments organized by the centre. The continuation of this practice is equally important. The annual tournaments held at the centre helps to build a sense of social and united connection. Like every year, the intra-institute tournaments build a sense of social and united connection. The intra-institute cricket and badminton tournaments were held in 2024 by the "Sports Activity wing" of Muktangan. The endless efforts and enthusiasm from the administrative staffs, students and the entire sports community helped to conduct a vibrant and smooth tournament. We are still in the middle of the year 2024, more sports events are yet to be announced.

Again, sincere acknowledgement to Prof. Tanusri Saha-Dasgupta (Director), Ms. Shohini Majumder (Registrar), Mr. Debashish Bhattacharjee (DR Admin.), Smt. Nivedita Konar (DR Academic) for their endless support and positive attitude towards all sports activities. Special thanks to Mr. Siddhartha Chatterjee, Mr. Supriya Ganguly, Mr. Suvendu Dutta, Mr. Swarup Dutta, Mr. Amitava Palit for making the events successful. We are grateful to Mr. Narayan Mondal and team for preparing a beautiful ground and Mr. Tanmoy Sil and team for the arrangement of lights.

### *Intra-institute tournaments in 2024*

#### **1. Intra-institute Cricket Tournament** *(10-11th February, 2024)*

Champion team members : **Rafiqul Alam (C)**, Amrit Kumar Mondal, Animesh Hazra, Dubhajit Mondal, Soumya Ghorai, Dhananjay Ghosh, Bikram Das, Kapil Gope, Abdul Aziz Mandal, Koushik Das, Rakesh Halder

Runners-up team members : **Bikram Baghira (C)**,

Anirban Paul, Banik Rai, Ritam Mahanta, Md. Sanowaz Molla, Aritra Marick, Sabuj Mandal, Sanatan Mandal, Haripada Sahoo, Narayan Chandra Maity, Arun Kumar Maurya, Aman Das.

Best batsmen : Anirban Paul, Subhajit Mondal

Best Bowler : Bikram Baghira

Best Fielder : Pratap Pal

Emerging players : Kapil Gope, Dhananjay Ghosh

Player of the tournament : Subhajit Mondal

#### **2. Intra-institute Badminton Tournament** *(17-18th February, 2024)*

Champion team members : **Sudip Chakrabarty (C)**, Sudip Pramanik, Sudipta Mitra, Anupam Gorai, Ramkrishna Patra, Samrat Sen, Subhanker Dutta, Soham Saha, Animesh Hazra, Soumita Chakraborty, Ananya Chakraborty.

Runners-up members : **Soumen Mandal (C)**, Sayan Ghosh, Jayarshi Bhattacharya, Pratap Pal, Md. Sanowaz Molla, Aman Das, Sahil Gopalkrishna Naik, Koushik Das, Narayan Chandra Maity, Dorothy Museo, Sayanti Mondal

Player of the tournament (male) : Subhanker Dutta

Player of the tournament (female) : Soumita Chakraborty

Emerging player (male) : Subhajit Mondal

Emerging player (female) : Ananya Chakraborty

## SOME GLIMPSES OF THE SPORTS TOURNAMENTS IN 2024



Group photo after Cricket Tournament



Champions



Runners-up



Group Photo after Badminton Tournament



Champions



Runners-up

## Photo Fest : 2023

**Anupam Gorai & Swarnali Hait**

Like every year, this year's Photofest was organised again during the auspicious event of Bose Fest 2023. The event took place on 1st, 2nd, and 3rd of March, 2023. This year, we received a total of 248 entries with 99 entries in MO category, 79 entries in MT category, 30 entries in CO category, 20 entries in CT category, 15 entries in PN category, and 5 entries in SC category from 103 individuals. The photography theme of this year was "Pattern" and the winners by judges decision were Anindita Mondal, Nirnay Samanta, Amrit Kumar Mondal, Sonali Sen, Sumanti Patra, Alik Panja, Debasis Mitra, Arnab Mukherjee, and Prantik Nandi from MT category, Prantik Nandi, Shubhrasish Mukherjee, Shashank Shekhar Pandey, Ramu Ghosh, Anusree Sen, Sanjay Ghosh, and Bikram Baghira from MO category, Indranil Chakraborty and Dhiraj Tapader from CT category, Indrayani Patra and Dhiraj Tapader from CO category, Shrabasti Banerjee, Shubhrasish Mukherjee, and Swarnali Hait from PN category, Anwesha Chakraborty from SC category. The winners by People's voting were Anwesha Chakraborty from MT, Ardhendu Pal from MO, Sreya Pal from CT, Subhankar Bera from CO, Ardhendu Pal from PN, Sudip Chakraborty from SC category.

Team Photofest 2023 is extremely grateful to our internal judges Mr. Rupam Porel and Mr. Gurudas Ghosh for their generous time and enormous support towards Photofest 2023. The team thanks Mr. Debarshi Duttagupta, current international brand ambassador of Fujifilm and managing Director of East India Pharmaceutical Works Limited, for his help as an external judge in Photofest 2023. The team thanks all the junior volunteers (Ishita Jana, Nishant Garg, Sudip Chakraborty, Sudip Pramanik) for helping with every work and the organizers Anupam Gorai and Swarnali Hait, on behalf of Visual Arts, Muktagan for doing their job relentlessly.

## Photo Fest : 2024

**Gurudas Ghosh & Rupam Porel**

Muktangan is a platform of various literary, cultural and sports activities conducted in SBNBCBS campus throughout the year. Visual Arts Group of Muktagan, along with the Bose Fest Team, organised Photo Fest 2024 during 23-24 February, 2024.

The Photo Fest 2024 was inaugurated at SBNBCBS campus by the Director, Prof. Tanusri Saha Dasgupta, and the Registrar, Ms. Shohini Majumder on 23rd February, 2024.

Total 199 photographs, 17 paintings, and 6 sculptures and crafts were displayed, which are received from the students, staff, faculty and alumni members, of the Centre. The Bose Fest is a festival of science, but the number of entries in different categories and Photo Fest visitors reflects the interest of SBNBCBS members in art and culture and also their creative minds.

*The Photo Fest team is extremely grateful to all the artists for their spontaneous participation. The team is also grateful to Mr. Debarshi Duttagupta, for performing his duty of external judge in Photo Fest 2024 in spite of his busy schedule. Last but not the least, the photofest team thanks to all the visitors of Photo Fest 2024. We hope that the cooperation and support will continue in coming years.*



## PHOTO FEST 2024

---





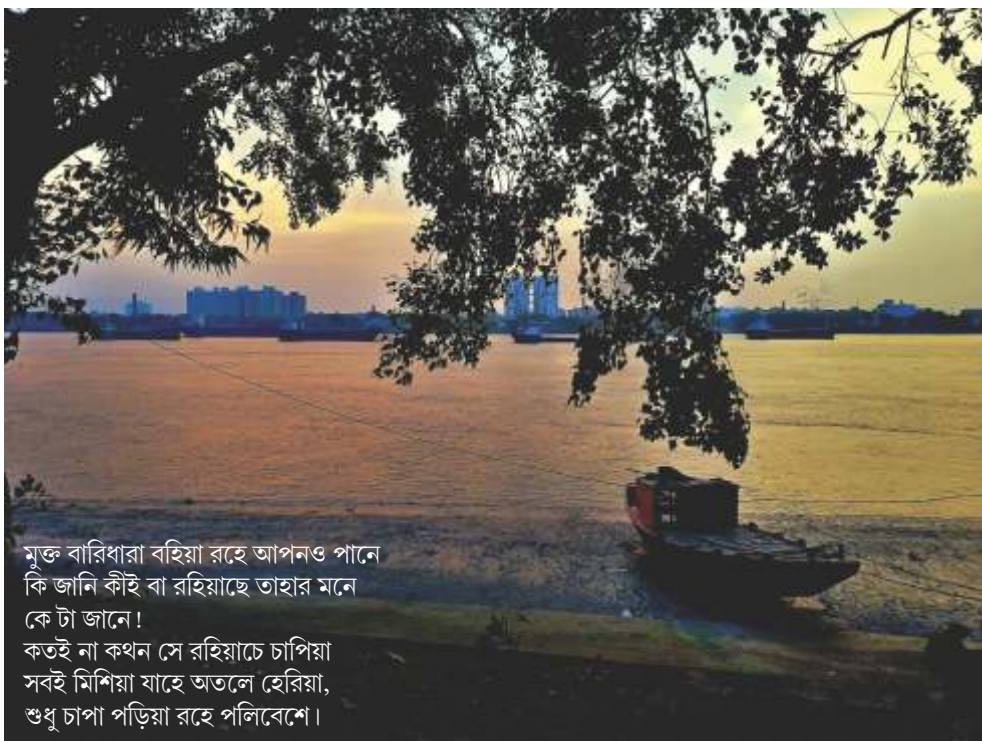


Mirror of soul

Ananya Chakraborty



Abdul Aziz Mandal



মুক্ত বারিধারা বহিয়া রহে আপনও পানে  
 কি জানি কীই বা রহিয়াছে তাহার মনে  
 কে টা জানে!  
 কতই না কখন সে রহিয়াছে চাপিয়া  
 সবই মিশিয়া যাহে অতলে হেরিয়া,  
 শুধু চাপা পড়িয়া রহে পলিবেশে।

Abdul Aziz Mandal



Abdul Aziz Mandal



Sweta Ghosh



Anusree Sen





Arnab Mukherjee



Voyagers

Arnab Mukherjee





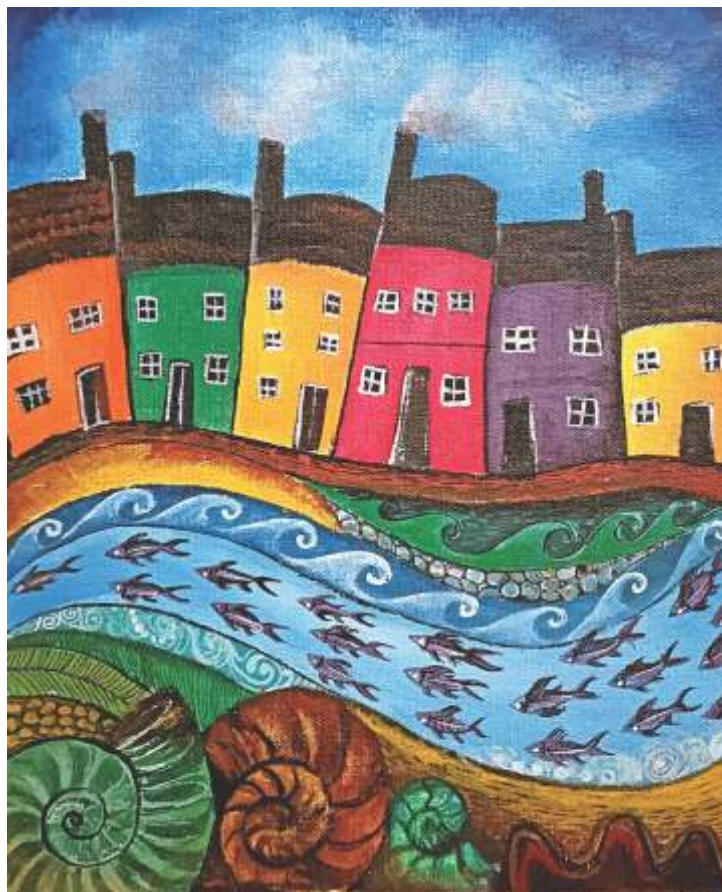
Mystic Woods.

Shaheerah Shahid



The celestial city

Shaheerah Shahid



Title- The colourfull Cosmos (From my  
memory of Corfu, Greece)  
Medium - Acrylic on Canvas

Anwesh Chakraborty



Campus

Sourav Mondal



“কালো ? তা সে যতই কালো হোক,  
দেখেছি তার কালো হরণি-চোখ।  
কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,  
আর যা বলে বলুক অন্য লোক।”

Sumanti Patra



অবসর

Sumanti Patra





Sunset

Asesh Bera



Reflection

Aripita Jana





মাছের চোখে বনেদি বাড়ি

Diraj Tapader



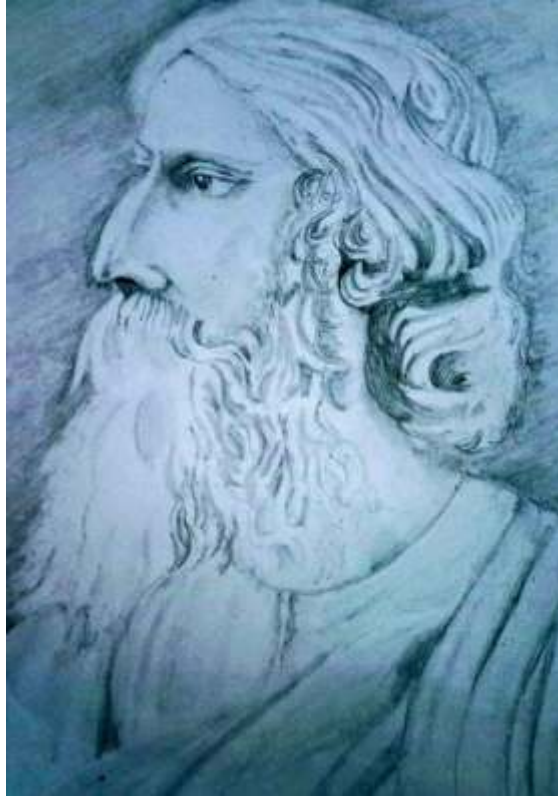
Triveni

Diraj Tapader



দুর্ভেদ্য

Abha Mahato



বিশ্বকবি

Suranjana Chakrabarty



নিসর্গ

Abha Mahato





Howrah Bridge: Hanging Heart of the City of Joy

Renu Singh



Mesmerizing Sunset on the river bank of Hooghly

Renu Singh



পাতা ঝরার মরশুম

Riju Pal



নদী আপন বেগে পাগল পারা..

Riju Pal





A Student-Staff Initiative [ The Literary Arts Group of Muktangan ]  
 S. N. Bose National Centre for Basic Sciences  
 Block- JD, Sector - III, Salt Lake, Kolkata - 700106  
 Email : [magazine.snbncbs@gmail.com](mailto:magazine.snbncbs@gmail.com)